লন্ডনে দাঙ্গা না বিদ্রোহ? পৃ. ৩

দুর্নীতির লজিক পৃ. ৮

নীতি–দুর্নীতির পাকেচক্রে
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পৃ. ১১

আইনি থেকে বেআইনি খনিজ উত্তোলন
দুর্নীতির অদৃশ্য লম্বা হাত পৃ. ২২

তিব্বতীদের চোখে চীন [২] পৃ. ২৬

শ্যামলী খাস্তগীর স্মরণে পৃ. ২

জুলাই–আগস্ট ২০১১ ❐ দ্বাদশ বর্ষ ❐ চতুর্থ সংখ্যা ❐ ৮ টাকা

মন্থন
সাময়িকী

বিলেতে একটা কাশ্মীর আছে, আছে মণিপুরও ...

বিলেতে একটা কাশ্মীর আছে, আছে মণিপুরও। সেখানেও 'সন্ত্রাসবাদী'কে গুলি করে রাস্তার ওপর ফেলে রেখে যায় পুলিশ। সেই 'সন্ত্রাসবাদী'র পরিবারের লোকের সঙ্গে দেখা করার সৌজন্যতাটুকুও ওরা [রাষ্ট্র] দেখায় না। কারণ 'সন্ত্রাসবাদী'র গুষ্টি শুদ্ধু সকলেই সন্ত্রাসবাদী, দেশদ্রোহী! শুধু দেশভেদে সন্ত্রাসবাদীর পরিচয়ের সামান্য কিছু তফাত। কোথাও সে কৃষ্ণাঙ্গ, কোথাও আদিবাসী, কোথাও কাশ্মীরি, কোথাও মণিপুরি। 'সন্ত্রাসবাদী' মরলে তার মায়ের চোখে জল পড়ে না। তার সন্তান কিছুই হারায় না। তার পড়শিদের কিছু আসে যায় না। কী ভারত, কী ব্রিটেন বা আমেরিকা, গ্লোবালাইজড পৃথিবীতে সর্বত্র 'সন্ত্রাসবাদী' নিকেশের জন্য একই রকম দস্তুর, একই ছাঁদের আইন।

লন্ডনে যখন গণ্ডগোল চলে, আগুন জ্বলে, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বিশ্লেষণ করতে বসে যায় ... এই যুব–বিদ্রোহ কতখানি নেতিবাচক, কতখানি বিপ্লবের গর্ভপাত, কতখানি বেকারত্ব–দারিদ্র্যের প্রতিফলন ... কিন্তু নিজের পরিবারের ছেলেমেয়ে–ভাইবোনের জায়গায় কি ওই ছেলেমেয়েদের একবারের জন্য বসানো যায়? ওদের আশা–আকাঙ্ক্ষা, ওদের আনন্দ উপভোগ, ওদের প্রেম–ভালোবাসা, ওদের স্বপ্ন কি আমাদের ঘরের বাচ্চাদের মতোই নয়? আমাদের ঘরে বাচ্চারা যখন বায়না করে, যখন কিছু চায়, তখন কি সাধ আর সাধ্যের হিসেবনিকেশকে সবটা মানে? তবু ওদের কথাগুলো শুনতে হয়, বুঝতে হয়।

তাই 'লন্ডন কেন জ্বলছে' বোঝার আগে আমরা বুঝতে চাই, আজকের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বুকের ভিতরটা কেন জ্বলছে? এবারের পত্রিকায় সেই চেষ্টা করা হয়েছে। লন্ডনের ঘটনায় তিন হাজারের বেশি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনটাই করা হয়েছিল এক বছর আগে কাশ্মীরে। আমেরিকা–ব্রিটেনের 'সন্ত্রাসবাদ' দমনের জবরদস্ত নতুন আইনগুলো নকল করে আমরাও এদেশে আইন বানিয়েছি। দুনিয়া জুড়ে আজ 'সন্ত্রাসবাদ' দমনে একই 'সন্ত্রাসবাদী' তরিকা!

এবারের পত্রিকায় আমরা দুর্নীতির প্রসঙ্গকে কিছুটা খতিয়ে দেখতে চাইছি। বুঝতে চাইছি, দুর্নীতির সঙ্গে ক্ষমতার যোগসাজশকে। ক্ষমতা যখন সর্বত্রগামী; যখন পরিবার, ইস্কুল, হাসপাতাল, সরকারি দপ্তর, পঞ্চায়েত সর্বত্র তার যাতায়াত; তখন দুর্নীতিও সমাজের ভাঁজে ভাঁজে ছাতলার মতো ধরে রয়েছে। কোথায় সেই রোদ্দুর, যা সমাজকে এই অনিবার্য পচন থেকে রক্ষা করবে?

শ্যামলী খাস্তগীর স্মরণে

জন্ম : ২৩ জুন ১৯৪০ **মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ২০১১**

শ্যামলী খাস্তগীরের জীবনাবসান হল ২০১১ সালের স্বাধীনতা দিবসের দিন। কয়েক সপ্তাহ আগে স্ট্রোক হয়ে তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং তখন থেকে তিনি ভুগছিলেন। জীবনের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা বিচ্ছুরিত হত তাঁর বাঙ্ময় দুটি চোখে। তাঁর দৃষ্টি ছিল সোজাসাপটা, অনুসন্ধানী। কেউ কেউ বলত বড়ো দুঃখী বিষাদময় সেই দৃষ্টি। সুন্দর সেই দৃষ্টিতে ফুটে উঠত জীবনের প্রতি, সমগ্র জীবজগতের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং এক সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা — যেখানে তিনি নিজে আর সক্রিয়ভাবে থাকবেন না।

তাঁর পিতা সুধীর খাস্তগীর ছিলেন এক প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর এবং বেঙ্গল স্কুল অফ ইন্ডিয়ান আর্টের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অত্যন্ত ছোটো বয়সে দুঃখজনকভাবে শ্যামলীর মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি দেরাদুনে বড়ো হয়ে ওঠেন এবং শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেন। ২১ বছর বয়সে চীনা যুবক তান লি-কে বিয়ে করার পর কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। সেখানেই ১৯৬৬ সালে তাঁদের পুত্র আনন্দ-র জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তান লির কাজের সূত্রে তাঁরা পশ্চিম কানাডায় চলে যান। সেখানেই পরিবেশ ও মানবসম্পদের ক্ষতির বিনিময়ে যেসব অর্থনৈতিক ও সামরিক উন্নয়ন হয়, সেসব বিষয়ে শ্যামলী প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। যেসব গোষ্ঠী এই ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হন। এইসব বিষয়গুলোকে তিনি নিজের দেশীয় পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, যে উদ্দেশ্যে এবং ক্ষোভ প্রকাশের যে উপায়ে ওই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি ওখানকার স্থানীয় উপকরণগুলোকে সংগ্রহ করে ভারতীয় রন্ধনপ্রণালীর অবয়বে সেগুলোকে সংহত করে এক অন্যন্য রন্ধনশৈলী গড়ে তুলেছিলেন। বেশ কয়েক বছর তিনি মধ্য আমেরিকা সহ ওখানকার নানা জায়গায় এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান। ওই সময়ে শ্যামলীর সঙ্গে তান লির বিচ্ছেদ ঘটে। শ্যামলী তখন পরমাণু অস্ত্র ও পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে খুবই দায়িত্বশীল এক প্রতিবাদী কর্মী। এই বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অহিংস আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য শ্যামলীকে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তারও করা হয়েছে এবং তিনি জেলও খেটেছেন। তাঁর অসুস্থ বাবাকে দেখভাল করার জন্য আর ছেলের কাছে থাকার জন্য শ্যামলী মাঝেমাঝে ভারতে ফিরতেন। এর আগেই অবশ্য তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শেখার জন্য ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮২ সালে শ্যামলী পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে আসেন।

ভারতে এসে শ্যামলী তাঁর মানসিকতার সঙ্গে মেলে এমন সব সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। অনেক সময় তিনি তাঁর ভিতরের কথা একাই সাহসভরে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছিল আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবীর নানা জায়গায় সামাজিক ন্যায় ও পরিবেশ নিয়ে যারা আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ। এগুলোর মূল্য ছিল অপরিসীম। এই গ্রহে বিভিন্ন জায়গায় যেসব মানুষ একই স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে এক যোগাযোগের সূত্র ছিলেন তিনি। অজস্র ঠিকানায় ভর্তি একটা নীল নোটবই, অনেকটা আজকের ওয়ার্ল্ড ওয়েবের মতো, কয়েক দশক ধরে অনেক অসাধারণ আন্তর্জাতিক যোগসূত্র তৈরি করেছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে শ্যামলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর হাঁপানির অসুখ এবং হাঁটার অসুবিধা তাঁকে খানিকটা কাবু করে ফেললেও তিনি বীরের মতো তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী পান্নালাল দাশগুপ্তকে তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর শ্যামলী নিজের বাড়িতে রেখে সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। তাঁর যাত্রা চলছিলই। ২০০২ সালে তাঁর নাতি তাও-এর জন্ম তাঁকে খুশি করেছিল। তাঁর ছেলে আনন্দও যে তাঁরই প্রিয় পথে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, তাতেও তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর বিভিন্ন কাজে নানারকম যে সৃষ্টিশীল উপায় গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব স্পষ্ট। তিনি নিজে ছিলেন এক প্রতিভাময়ী শিল্পী। তিনি নানারকম পোস্টার এঁকে ও পুতুল নাচের প্রদর্শনী করে তাঁর বক্তব্যগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন যাদের কাছে আর অন্যভাবে ওগুলো পৌঁছানো সম্ভব হত না। এইভাবে সারাজীবন ধরে শ্যামলী বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়েছেন, কোনোরকম প্রভেদ না রেখে বা পূর্বধারণাবশত কোনো মানুষকে বাদ না দিয়ে। এইজন্য তিনি অনেক মানুষের ভালোবাসা ও আদর পেয়েছেন। গ্রামসমাজের লোকেরা তাঁকে খুব ভালোবাসত। কারণ তিনি তাদের মধ্যে অক্লান্তভাবে কাজ করতেন। এবং সবসময় বলতেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তিনি যা দিয়েছেন তার চেয়ে পেয়েছেন অনেক বেশি। তাঁর চিন্তাপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গী ছিল এক শিল্পীর মতো। যারা একটু প্রথাগত কায়দায় বিতর্কে অভ্যস্ত, তারা কিন্তু অনেক সময় ওঁর কথা শুনে একটু বিব্রত হত এবং সেই অবকাশে একজন গভীর চিন্তাবিদকে চিনতে ভুল করত। শ্যামলীর প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল সাধারণভাবে আপন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কিন্তু সেই প্রত্যয় নির্মাণে যেভাবে তিনি যুক্তি সাজাতেন তা ছিল খুবই আকর্ষণীয় ও অপ্রত্যাশিত। খুবই উচ্চ আদর্শের এক ব্যক্তি হিসেবে তিনি চাইতেন তাঁর চারপাশের সবাইও যেন অমনটাই হয়। তিনি কখনও তাঁর মতামত খোলামনে ও স্পষ্ট করে বলতে ভয় পেতেন না। অনেক সময় হয়তো এই কারণে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্ক হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু তাঁর এই আচরণের মধ্যে ছিল সত্যের প্রতি এক নিঃস্বার্থ আনুগত্য।

সত্যের প্রতি তাঁর এই আনুগত্যের ভার বহন করা নিয়ে কারোই কোনো সন্দেহ নেই। তবু অনেক অজানা উৎস থেকে আলোকিত হয়ে তিনি তাঁর সতেজতা ও উদারতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। যথাসময়ে প্রাণখোলা হাসিতে তিনি মন ভুলিয়ে দিতেও পারতেন। কঠিন অসুখ থেকে আরোগ্যলাভের সময় যখন সবার মন অশান্তিতে পীড়িত, তখনও তিনি অমন করে হাসি দিয়ে সবার কষ্ট ভোলাতেন। এর থেকে বোঝা যায় তাঁর অন্তরে এক সদাহাস্যময় মানুষ সমস্ত

... পরবর্তী অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে দাঙ্গা না বিদ্রোহ?

একটি সাক্ষাৎকার

'ডেমোক্রেসি নাও' টিভি চ্যানেলের পক্ষে ১০ আগস্ট ২০১১ অ্যামি গুডম্যান-এর সঙ্গে লন্ডন থেকে ডার্কাস হাওই ও রিচার্ড সেমোর-এর কিছু কথাবার্তা হয়। ৯ আগস্ট বিবিসি নিউজ-এর পক্ষ থেকে ফিওনা আর্মস্ট্রং ডার্কাস হাউইয়ের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে ডার্কাস হাউইয়ের স্পষ্ট বক্তব্যে ভীত হয়ে বিবিসি তার সম্প্রচার বন্ধ রাখে। কিন্তু সেই সাক্ষাৎকার ইউটিউব-এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ইন্টারনেট শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে যায়। নিন্দার ঝড় বয়ে যায় বিবিসির সাংবাদিকের প্রতি। অবশেষে বিবিসি ডার্কাস হাউইয়ের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ১০ আগস্ট বিবৃতি দেয়।

প্রসঙ্গত, লন্ডন এবং ইংল্যান্ডের শহরগুলির ঘটনাবলীর একটি যথাযথ বিবরণ জনপ্রিয় মিডিয়াতে পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে, তা হল সংবাদের নামে কিছু বাগাড়ম্বর এবং চটজলদি গতানুগতিক কিছু সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। এই ঘটনাবলীর এক প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ এবং অনুভূতির কথা জানতে ডার্কাস হাওই এবং রিচার্ড সেমোরের সঙ্গে 'ডেমোক্রেসি নাও'-এর কথাবার্তা আমরা এখানে প্রকাশ করছি। এটি বাংলায় তর্জমা করেছেন তমাল ভৌমিক। বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য পত্রিকার পক্ষ থেকে পাদটীকা সংযোজন করা হল। সূত্র : উইকিপিডিয়া।

অ্যামি গুডম্যান : এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে পুলিশ গুলি করে মারার প্রতিবাদে শনিবার যে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে, তা এখন সারা ব্রিটেনে ছড়িয়ে পড়ছে। পুলিশের সন্দেহ, ওই যুবক এক গুন্ডাদলের সদস্য। বিক্ষুব্ধ জনতা ম্যানচেস্টার, স্যাফোর্ড, লিভারপুল, নটিংহাম ও বার্মিংহামে পুলিশ স্টেশন এবং দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

সেসময় ইতালিতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন। কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর তিনি তড়িঘড়ি ফিরে এসে পার্লামেন্টের সদস্যদের ডেকে পরিস্থিতি সামাল দিতে বলেছেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তার অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছে, সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে এবং প্রয়োজনে প্লাস্টিকের বুলেট ছুঁড়ে দাঙ্গা থামাও। লন্ডনে গতকাল ১৬,০০০ পুলিশ রাস্তায় নেমেছিল। ব্রিটেনের রাজধানীর ইতিহাসে এত বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি আগে কখনও দেখা যায়নি।

ইতিমধ্যে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট পুলিশ কমপ্লেন্ট কমিশন'[১] আইপিসিসি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছে যে মার্ক দুগান নামে ২৯ বছর বয়সি যে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মৃত্যুতে এই দাঙ্গার শুরু, তার ওপর পুলিশ গুলি চালানোর আগে সে কোনোরকম গুলি চালায়নি।

র‍্যাচেল সেরফোন্টাইন : এ বিষয়ে একটা অন্যতম প্রধান ঘটনা আমি বলতে পারি। 'ফরেন্সিক সায়েন্স সার্ভিস' পরীক্ষা করে জানিয়েছে যে, এমপিএস (লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশ সার্ভিস) পুলিশের রেডিওতে যে গুলির দাগ দেখানো হয়েছে, তা জ্যাকেটবৃত গুলির ছিদ্র। এই ধরনের গুলি পুলিশই ব্যবহার করে। এই বিষয়ে ডিএনএ পরীক্ষা বাকি আছে। তবে অবশ্যই এই গুলি চালানো হয়েছে 'এমপিএস হেকলার কচ এমপিফাইভ' নামক আগ্নেয়াস্ত্র থেকে।

অ্যামি গুডম্যান : মার্ক দুগানের পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, তার মৃত্যু যে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার জন্য তাঁরা দুঃখিত। 'ইনকোয়েস্ট' নামক মানবাধিকার গোষ্ঠীর কর্মী হেলেন শ জানাচ্ছেন, দুগানের আত্মীয়রা এইরকম বিক্ষোভে পীড়িত বোধ করছে।

দুগানের পরিবারের সদস্যরা জানাতে চায় যে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মার্কের হত্যার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা সকলকে একথাও জানাতে চায়, এই বিশৃঙ্খলার ফলে দেশ জুড়ে বিভিন্ন অংশের মানুষ যে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে, তাতে তারা খুবই পীড়িত বোধ করছে। — হেলেন শ

অ্যামি গুডম্যান : দুগানের মৃত্যুর সঙ্গে এই বিক্ষোভকে জড়াতে চান না ব্রিটেনের উপপ্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ। তাঁর মতে এই বিশৃঙ্খলা 'অকারণ, কিছু সুবিধাবাদী চুরি ও হিংস্রতা। এর বেশি কিছু নয়, কমও নয়।'

যাই হোক, বিক্ষোভের আজ চতুর্থ দিন। লন্ডনে ৭৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ম্যানচেস্টার ও স্যাফোর্ডে কম করে ৫০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা বাড়ি ও গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছিল। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমরা লন্ডনে যাই। সেখানে যোগাযোগ করি ডার্কাস হাউই-এর সঙ্গে। তিনি বেতার ও টিভির একজন বার্তাবাহক এবং সংবাদপত্রের বিভাগীয় লেখক। থাকেন দক্ষিণ লন্ডনের ব্রিক্সটনে। তিনি টিভিতেও কাজ করেছেন। এঁর একটা বিখ্যাত কাজ হল 'হোয়াইট ট্রাইব', যেখানে তিনি ব্রিটেনের অ্যাংলো-স্যাক্সনদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। ১৯৮১ সালে 'নিউ ক্রস ফায়ার'[২] তদন্তে ১৩ জন কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরের মৃত্যুর জন্য পুলিশের কর্তব্যে অবহেলা ও অদক্ষতাকে দায়ী করা হয়। এর প্রতিবাদে হাউই কুড়ি হাজার কালো মানুষের এক মিছিল সংগঠিত করেছিলেন।

এছাড়াও, আমরা লন্ডনে যোগাযোগ করি ব্রিটেনের জনপ্রিয় ব্লগার রিচার্ড সেমোরের সঙ্গে। এঁর ব্লগের নাম 'লেনিন'স টম্ব'।

---

১ ১৯৮১ সালে ব্রিক্সটন 'দাঙ্গা'র তদন্ত করতে ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারি উইলিয়াম হোয়াইটল লর্ড স্কারম্যান-এর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, পুলিশের হাতে যথেচ্ছ খানাতল্লাশির ক্ষমতা রয়েছে। পুলিশের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য 'পোলিশ অ্যান্ড ক্রিমিনাল এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৯৮৪' নামে এক আইন তৈরি করা হয়। সেই আইন অনুযায়ী ১৯৮৫ সালে স্বাধীন 'পোলিশ কমপ্লেইন্টস অথরিটি' গঠিত হয়, যাতে পুলিশের ওপর জনসাধারণের আস্থা ফিরে আসে।

২ দক্ষিণ লন্ডনের ব্রিক্সটনে মূলত আফ্রিকান-ক্যারিবিয়ান সমাজের বাস। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সেখানকার নিউ ক্রস এলাকায় একটা বাড়িতে আগুন লেগে ১৩ জন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক মারা যায়। সন্দেহ করা হয়, বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব থেকে আগুন লাগানো হয়েছিল এবং এই ঘটনার পুলিশি তদন্ত জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ সৃষ্টি করে। মার্চ মাসে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের এক বিশাল মিছিলের দিন ফ্লিট স্ট্রীটে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এপ্রিল মাসে মেট্রোপলিটান পুলিশ সাদা পোশাকে 'অপারেশন সোয়াম্প ৮১' শুরু করে। পাঁচদিনে ব্রিক্সটনে ১০০০ জনকে রাস্তায় থামিয়ে তল্লাশি করা হয় এবং ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর থেকেই সূত্রপাত হয় ব্রিক্সটন 'দাঙ্গা'র — অন্য মতে তা ছিল ব্রিক্সটন 'বিদ্রোহ'।

এছাড়া, তাঁর দুটি বিখ্যাত লেখা হল, 'দ্য লিবারেল ডিফেন্স অফ মার্ডার' এবং 'দ্য মিনিং অফ ডেভিড ক্যামেরন'।

প্রথমে ডার্কাস হাউই-কে প্রশ্ন করি, আপনাদের দেশে এখন ঠিক কী ঘটছে? ব্রিটেনের অবস্থাটা বলুন।

ডার্কাস হাউই : এটা একটা গণবিদ্রোহ। আর আমি কোনো দাঙ্গা সম্পর্কে বলছি না। আমি গণবিদ্রোহ সম্পর্কে বলছি, যা সমাজের গভীর থেকে উঠে এসেছে, কালো ও সাদা যুবকদের সামগ্রিক চেতনা থেকে। অবশ্যই কালোদের সংখ্যা বেশি। তাদের যখন তখন বিনা কারণে যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে পুলিশ তল্লাশি করে। এর জন্য ওরা আইনও পাল্টে নিয়েছে। আগে এরকম তল্লাশি চালাতে হলে একটা অভিযোগ খাড়া করতে হত, যেমন — এই তুমি ওরকমভাবে তাকিয়েছ, বা হেন-তেন করেছ, কোনো মহিলাকে ধাক্কা দিয়েছ, বা কারও ব্যাগে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেছ। এখন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নতুন আইনের সাহায্যে যেখানে সেখানে যখন তখন পুলিশ তল্লাশি চালাতে পারে। আগের মতো কোনো অভিযোগও খাড়া করতে হয় না। আমার নাতির বয়স ১৪ বছর। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, 'নাথান, তোমায় কতবার ওরকম দাঁড় করিয়ে তল্লাশি করা হয়েছে।' সে বলেছে, 'দাদু, সে যে কতবার, আমি গুনেও তোমায় বলতে পারব না।' এই ক্রোধ তলায় তলায় ফুঁসছিল। কারণ শতসহস্র তরুণ কিশোরের একই রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তারা তো একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই মার্ক দুগান খুন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করল। জীবন মানে কী আর কী নয়, সেটা সবার মনেই ছিল।

দ্বিতীয় বাস্তব ঘটনা হল, ওদের এখন ছুটি চলছে। স্কুলের বর্ষ শেষ। আর, আপনাদের কৈশোরের কথা মনে করুন, ক্লাসরুমে যে আটকা থাকে তার মনটা বাইরে বেরোনোর জন্য আনচান করে। বাইরে বেরোলেই মুক্তি — আহা, প্রাণের মুক্তি। শ্বাস ছেড়ে হা হা করে হাসা যায়, 'স্কুল নেই, বাঁদরের খাটনি নেই'। এই একটা সময় বটে। আমার মনে হয়, জানুয়ারি বা অক্টোবরের মাঝামাঝি হলে এমনটা ঘটত না। এখন গ্রীষ্মের উষ্ণতা। কিছু কিছু রাত সত্যি বেশ গরম।

আর এসময় মার্ক দুগান প্রাণ হারাল। 'অপারেশন ট্রাইডেন্ট'[৩]-এর নাম এবং সেই অপারেশনের কথা আমরা অনেকদিন ধরে জানি। ওরা খুনের তদন্ত করতে আসত আর তা বেশ বুদ্ধি খাটিয়েই করত। আমি খোলা মনেই বলছি, ওদের তদন্তকারী দলটা আগে বেশ ভালো ছিল। কিন্তু এখন মেট্রোপলিটান পুলিশের সব কিছুই পাল্টে গেছে। সম্ভবত যুক্তরাজ্যে এখন এটা সবচেয়ে লজ্জাজনক সংগঠন। এদের কোনো পরিচালক নেই, কোনো ডেপুটি কমিশনার বা কমিশনার নেই। ফলে এই ধরনের বিশেষ অপারেশন, যার নাম 'রেজরব্যাক' বা 'ট্রাইডেন্ট' অপারেশন, সব পুলিশই সেসবের মাথা। এরা সব জায়গাতে গিয়েই ওস্তাদি দেখাচ্ছে, এদের উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের নজরে আসা এবং ডেপুটির মতো নানা উঁচু পদে ওঠা। আর সেইজন্য ওরা টোটেনহামে গিয়েছিল, যেখানে প্রথম বিস্ফোরণের ঘটনাটা ঘটে। সেখানকার আঞ্চলিক কমান্ডারকে কোনো খবর না দিয়েই ওরা গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে ছিল গ্লক হেকলার পিস্তলের মতো মারাত্মক অস্ত্র। ওর চেয়ে প্রাণঘাতী অস্ত্র আর হয় না। ওরা প্রকাশ্যে ঝকঝকে দিনের আলোয় দুগানের বুক ফুঁড়ে দিল। এতদিন ওরা বলছিল, দুগানের কাছেও পিস্তল ছিল। আর এখন বলছে, তা নয়, আমরা কিছুই জানি না।

যখন ওর পরিবারের লোকজন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে জানতে চাইল, তখন ওখানকার কমান্ডার ওদের সঙ্গে কথা বলেননি। কারণ তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন অকুস্থলে যে পুলিশেরা উপস্থিত ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটাকে ঘেঁটে দিতে। কেউই কিছু জানতে পারল না। ওরা ওদের কাজ করে চলে গেল। এই হচ্ছে মেট্রোপলিটান পুলিশের অবক্ষয়ী চেহারা। ওদের শুধু প্রতিযোগিতা — – কে কমিশনার হবে, কে ডেপুটি কমিশনার হবে। প্রত্যেকেই ওরা চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে আর বুক বাজিয়ে বলবে, 'আমিই উঁচু পদে বসার যোগ্য'। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মানসিকতাই এখন এরকম।

অ্যামি গুডম্যান : আমি এখন আমাদের আলোচনায় রিচার্ড সেমোরকে অংশ নিতে আহ্বান করছি।

ডার্কাস হাউই : হ্যাঁ, ঠিক আছে।

অ্যামি গুডম্যান : আমি রিচার্ডকে বলছি, একদম শুরুর আলোচনায় চলে যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ ২৯ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ যুবক মার্ক দুগানের[৪] হত্যার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। রিচার্ড, আপনি তো এ বিষয়ে লিখেছিলেন। পুলিশ প্রথমে কী বলেছিল? কিছুটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এখন তারা কী বলছে, যাতে সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে? আপনি এ বিষয়ে বলুন।

রিচার্ড সেমোর : হ্যাঁ, হত্যার প্রেক্ষাপট ওরা এমনভাবে সাজিয়েছিল যাতে জনসাধারণ বিশ্বাস করে যে মার্ক দুগানের কাছে অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্র থেকে সে পুলিশের ওপর গুলি ছুঁড়েছিল। অতএব সবাই ধরে নেবে যে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালিয়েছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আইপিসিসি এটা নিশ্চিতভাবে জানিয়েছে, গুলি যেটা ছোঁড়া হয়েছিল এবং যা পুলিশের রেডিওতে আঘাত করেছে, সেটা

---

৩ ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে অপারেশন ট্রাইডেন্ট নামে মেট্রোপলিটান পুলিশের একটি শাখা গঠন করা হয়, যারা বেআইনি মাদক বিক্রিকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বন্দুক নিয়ে অপরাধমূলক কাজের নজরদারি করবে। ট্রাইডেন্ট কথার অর্থ ত্রিশূল। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিযানের নামও ছিল 'অপারেশন ট্রাইডেন্ট'।

৪ ৪ আগস্ট সন্ধ্যা সওয়া ছ'টা নাগাদ টোটেনহাম হেলের ফেরি লেন ব্রিজের ওপরে পুলিশ একটি মিনিক্যাব থামিয়ে আরোহী মার্ক দুগানকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে এবং দুবার গুলি চালায়। দুগানের বুকে গুলি লাগে। ওইদিনই রিপোর্ট করা হয় এবং সমস্ত মিডিয়া প্রচার করে, এক পুলিশ অফিসারের ওপর গুলি চালানোর পর দুগানকে গুলিবিদ্ধ করা হয়। পাঁচ সন্তানের পিতা দুগান মারা যান। পরদিন আইপিসিসি স্বীকার করে, রিপোর্টে 'অনিচ্ছাকৃত' ভুল হয়েছে। ফলে টোটেনহামে তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশিরা দাবি করে, 'আমরা সত্যটা জানতে চাই, কীভাবে মার্ক মারা গেল, সেই তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়ছি না।' এমনকী আইপিসিসি-র নিরপেক্ষতা সম্পর্কে তাঁর পরিবার সরাসরি প্রশ্ন তোলে এবং স্বাধীনভাবে দ্বিতীয় পোস্টমর্টেম করার দাবি করে। তাঁকে মাদক-বিক্রেতা এবং গ্যাঙস্টার হিসেবে চিহ্নিত করার প্রতিবাদে দুগানের এক পারিবারিক বন্ধু জানান, 'সে গ্যাঙ সদস্য নয় এবং ওর কোনো অপরাধের রেকর্ড নেই। ওর ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু রয়েছে, যারা সপ্তাহে একদিন অন্য কিছু করে, যেমন ছেলেবেলার বন্ধুরা একত্রিত হয়। কিছু লোক ওদের গ্যাঙ হিসেবে চিত্রিত করতে চাইছে।'

পুলিশেরই বুলেট। অতএব এটা একটা কৌতূহল-উদ্দীপক প্রশ্ন যে কে গুলি ছুঁড়েছিল এবং কেন ছুঁড়েছিল? পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কে এটা করেছে? কিন্তু দুগান অবশ্যই গুলি ছোঁড়েনি। অতএব ওরা মিথ্যা বলেছে।

এর পাশাপাশি, ওরা দুগানের পরিবারকে কিছু জানায়নি। মিডিয়া মারফত পরিবার ঘটনাটা জেনে যাক, এরকমভাবেই বিষয়টাকে ফেলে রাখা হয়েছিল। দুগানের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোনো অফিসারকে ওরা পাঠায়নি। এরকম এক অস্বাভাবিক ঘটনায় যেসব সাধারণ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা, তার কোনোটাই ওরা নেয়নি। সাধারণভাবে এটা বলাই যায় যে এর ফলে পুলিশের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া থেকেই এই প্রত্যাঘাতের সূচনা।

আরেকটা কথাও আমি বলতে চাই। মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রতিযোগিতার বিষয়ে ডার্কাস যা বলেছেন, সেই প্রসঙ্গে। এখানে পরিপ্রেক্ষিতটা গুরুত্বপূর্ণ। 'নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে 'নিউজ ইন্টারন্যাশনাল'-এর যে সাম্রাজ্য, তার সঙ্গে মেট্রোপলিটান পুলিশের ওপরমহলের কর্তাদের সম্পর্ক নিয়ে এক কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গেছে। এর ফলে পুলিশ বাহিনীতে এক গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। সংকটের নানা চেহারার মধ্যে নৈতিক সংকটও বিরাটভাবে আছে। আর এর জন্যই এই মুহূর্তে এদের মধ্যে এত বেশি বিশৃঙ্খলা। এটা আরও বাড়বে। এদের হাতে আজকেই নতুন অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। ডেভিড ক্যামেরন পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে জলকামান ব্যবহার করো। এটা এই দেশে প্রথম।

অ্যামি গুডম্যান : একটু বুঝে নিই, ওটা আপনি [রুপার্ট] মার্ডকের[৫] কেলেঙ্কারি নিয়ে বলছেন —

রিচার্ড সেমোর : হ্যাঁ।

অ্যামি গুডম্যান : আপনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের উঁচু কর্তাব্যক্তিদের কেলেঙ্কারির কথা বললেন। এবার মার্ক দুগানকে হত্যার দিন পুলিশ স্টেশনে রাতে যে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু বলবেন?

রিচার্ড সেমোর : হ্যাঁ। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতাকে কিছুটা উসকে দেওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। যা জানি, এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় জনসমাজের সমাজকর্মীরা। তারা জবাব চাইছিল, পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু পুলিশ কোনো জবাব দিচ্ছিল না, একটা ধোঁয়াটে পরিবেশ তৈরি করছিল। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যাচ্ছে, প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে যখন ষোলো বছরের এক প্রতিবাদী মেয়েকে পুলিশ আক্রমণ করে। দাঙ্গারোধকারী পুলিশ বাহিনী যেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেই লাইনের সামনে গিয়ে মেয়েটা চেঁচিয়ে জবাব চায়। পুলিশেরা মেয়েটাকে লাঠি ও ঢাল দিয়ে পেটায়। সেই দৃশ্যের কিছুটা আপনারা টিভিতেও দেখে থাকবেন। তাতে দেখা যায়, মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে আর তাকে প্রচণ্ডভাবে লাথি মারছে কয়েকজন পুলিশ। আরও কয়েকজন নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী এই ঘটনাটার সাক্ষ্য দিয়েছে। সুতরাং আমি বলব যে পুলিশ ওই পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজক করার পক্ষে যথেষ্টর চেয়েও বেশি পরিমাণে উস্কানি দিয়েছে। অতএব এই প্রশ্ন উঠবেই, যে পুলিশ উস্কানি দিয়ে সমস্যা বাড়ায়, সেই পুলিশ সমস্যার সমাধান করবে কীভাবে?

[**বিরতি**] লিনটন কুরেসি জনসন ডার্কাস হাউইয়ের উদ্দেশ্যে 'ম্যান ফ্রি' নামে একটা গান করেন।

অ্যামি গুডম্যান : 'ম্যান ফ্রি' গানটা আমাদের অতিথি ডার্কাস হাউইয়ের জন্য। ডার্কাস বলুন, গানটা কেমন? আর ব্রিক্সটনে আপনাদের সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। বলুন, আজকে যা ঘটে চলেছে, যখন সারা ব্রিটেনে এক হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ওই ইতিহাসের সঙ্গে তা কতটা খাপ খায়?

ডার্কাস হাউই : ১৯৮১ সালে ব্রিক্সটনে যা ঘটেছিল, আজকের ঘটনা যেন ঠিক তার পুনরাবৃত্তি। ওরা প্রত্যেককে থামিয়ে তল্লাশি করছিল আর মারছিল। ওটার নাম ছিল 'অপারেশন সোয়াম্প', মানে প্লাবিত করা বা ডুবিয়ে দেওয়া। ওরা সত্যিই আমাদের সমাজটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। চলাফেরা করতে সক্ষম কোনো পুরুষ যদি কালো হয়, তাকেই ওরা ধরছিল। কালো আর সাদাদের মধ্যে পরিষ্কার তফাত টানা হয়েছিল। ফলে বিস্ফোরণটা ঘটেছিল। জায়গাটা আমার বাড়ি থেকে চল্লিশ গজ তফাতে হবে। আমি ছিলাম 'দ্য জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক। তার হপ্তাখানেক আগে আমি কুড়ি হাজার কালো মানুষের একটা মিছিলে নেতৃত্বও দিয়েছিলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'চলো আমরা রাস্তার ওপাশে আমাদের অফিসে গিয়ে বসি।' ভেবেছিলাম সেটাই ভালো হবে। আমার অফিসের সামনে একসারি পুলিশ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারা আমায় জিজ্ঞেস করল, 'দাঙ্গার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?' আমি বললাম, 'পুলিশকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি কোথায় কখন ছিলাম, সে খবর তো বটেই, এমনকী আমি ফোনে কাকে কী বলেছি সবই পুলিশের কাছে রেকর্ড করা আছে।'

এবারেও ঘটনায় একটা স্বতঃস্ফূর্ততা আছে। কিন্তু সবসময়ের মতো এবারেও একইরকম দুর্বলতা আছে প্রেস ও সংবাদ-পরিবেশকদের। ওদের কাছে খবর আসে, ঠিক যেমন রাত্রিবেলায় ঘরে চোর আসে তেমনভাবে। কারণ ওদের কারবার কেবল কী ঘটে গেছে তাই নিয়ে। কী ঘটতে পারে বা আনুমানিক সত্য নিয়ে নয়। অতএব ওরা সবসময়ই অবাক হয়ে যায়। আর যখনই ওরা অবাক হয়ে যায়, তখনই ওরা নিজেদের ঘাটতিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য কিছু লোককে দোষী হিসেবে খুঁজে নেয়। যখনই ওরা অবাক হয়, তখনই ঘটনার পিছনে কিছু লোকের ষড়যন্ত্রের একটা ছক ওরা তৈরি করে নেয়। আমি জানি না ওরা মঙ্গলগ্রহ থেকে নাকি অন্য কোথা থেকে আসে। আসলে এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন।

এখন ব্রিক্সটনের পর দাঙ্গা পাক খেয়ে বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার হয়ে লিড্স, ব্রাডফোর্ড সর্বত্র পৌঁছে গেছে। দক্ষিণের সাইরেনসেস্টার বলে

---

৫ গ্লোবাল কর্পোরেট রুপার্ট মার্ডকের মালিকানাধীন 'নিউজ কর্পোরেশন'-এর সাবসিডিয়ারি 'নিউজ ইন্টারন্যাশনাল'-এর সংবাদপত্র ১৬৮ বছরের পুরনো 'নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর কর্মাচারীদের বিরুদ্ধে ফোনে আড়িপাতা এবং পুলিশকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ১৫ জুলাই নিউজ ইন্টারন্যাশনালের সিইও রেবেকা ব্রুক্স এবং 'দাও জোন্স অ্যান্ড কোম্পানি'র সিইও লেস হিন্টন পদত্যাগ করেন। ১৭ জুলাই দুর্নীতির দায়ে ব্রুক্সকে গ্রেপ্তার করা হয়। মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার স্যার পল স্টিফেনসন পদত্যাগ করেন। এর মধ্য দিয়ে কর্পোরেট জগৎ, মিডিয়া এবং পুলিশের এক যৌথ অপরাধ-চক্র সকলের সামনে উন্মোচিত হয়। এই দুর্নীতির সরকারি তদন্ত চলছে। ১৯ জুলাই রুপার্ট মাডককেও পার্লামেন্টারি মিডিয়া কমিটির কাছে জবাবদিহি করা হয়।

একটা জায়গা, যে জায়গাটা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না, সেটাও দাঙ্গা কবলিত হয়ে পড়েছে। ওই জায়গাটা গ্লসেস্টারশায়ার অঞ্চলে, কিন্তু সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ থাকে কিনা আমি জানি না। সব মিলে দাঙ্গার সর্পিল গতি আবার সেই ১৯৮১–র পথ ধরেই এগোচ্ছে।

অ্যামি গুডম্যান : ডার্কাস, এই জনসমাজগুলোর মধ্যে কি কোনো মিল রয়েছে?

ডার্কাস হাউই : আদৌ কোনো তফাত নেই। বিদ্রোহ আর লুটতরাজ কোনোটাতেই এতটুকু তফাত নেই। আমার মনে হয়, স্কুলগুলো ছুটি থাকায় এখন লুটতরাজ কিছু বেশি হচ্ছে। তরুণদের ব্যাপারে একটা বিষয় আমি বুঝি। কারণ আমিও একসময় তরুণ ছিলাম। আমিও তখনকার উঠতি ফ্যাশনের জিনিস খুব পছন্দ করতাম, সেগুলো না পেলে আমার মেয়ে বন্ধুও জুটবে না। তরুণদের মনোভাব এমনই। ভালো প্যান্ট–জুতো চাই।

অ্যামি গুডম্যান : ডার্কাস, লন্ডনের মেয়র বরিস জনসন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য জানতে চাই। বরিস মঙ্গলবার দক্ষিণ লন্ডনের ক্ল্যাপহামের রাস্তায় ঝাঁটা হাতে হেঁটেছেন। ওই এলাকাটা সবচেয়ে বেশি দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার মধ্যে একটা। ওখানকার বাসিন্দারা সেদিন পথ পরিষ্কারের কর্মসূচি নিয়েছিল। যারা এই বিক্ষোভকে সমর্থন করছে, মেয়র বরিস ওখানে তাদের সমালোচনা করেছেন।

জনসাধারণের সম্পত্তি ধ্বংস করা ও অপরাধমূলক কাজের পিছনে গভীর সামাজিক কারণ আছে — এই ধরনের নির্বোধ কথাবার্তা শোনা আমাদের এখনই বন্ধ করা উচিত। মানুষের নানারকম ক্ষোভ থাকতেই পারে। কিন্তু তার জন্য কারও দোকান ভাঙচুর করা, জীবিকার ক্ষতি করা, চাকরি খেয়ে নেওয়ার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এটা সঠিক আচরণ নয়। এই পথে শহরের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন হতে পারে না। — মেয়র বরিস জনসন

অ্যামি গুডম্যান : এই হচ্ছে লন্ডনের মেয়রের বক্তব্য। ডার্কাস হাউই, আপনি কি এই বিক্ষোভকে নিন্দা করেন? যে দাঙ্গা এই মুহূর্তে ব্রিটেনের দরিদ্রতম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই একাংশের ব্যাবসা–বাণিজ্যের ক্ষতি করছে এবং তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তাকে কি আপনি নিন্দা করছেন?

ডার্কাস হাউই : ইতিহাসের একটা কোনো পর্যায়ে কালো আমেরিকানদের ক্রোধের কথা আমেরিকানরা মনে রাখবে। শিকাগোয় প্রত্যেকদিন যখন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছিল, র‍্যাপ ব্রাউন সেই বিস্ফোরণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, 'জ্বাল বেবি, জ্বাল' শ্লোগান দিয়ে। তাঁর এই শ্লোগানকে সমর্থন জানিয়েছিল সমস্ত প্রগতিপন্থী বা বিপ্লববাদী শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গরা। এর একটা কারণ ছিল।

দ্বিতীয়ত, এখানে এরা এখন খুব গরিব। আমি কখনও এখনকার মতো এত গরিব যুবসমাজ দেখিনি। এদের মাঝখান দিয়ে তুষারপাতের মতো বয়ে চলেছে অজস্র বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনে সব নামজাদা লোকেরা অত্যাধুনিক জুতো–জামা পরে আর মাথায় ছোট্ট টুপি লাগিয়ে চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে। আর এই ছেলেমেয়েগুলোর ওসব কেনার পয়সা নেই। ওরা দোকানের শো–কেস ভেঙে ওইসব চুরি করছে।

আমি ইংরেজ সরকারের গীর্জার খ্রিস্টান অনুগামী নই। আমার বাবা তা ছিলেন। আমি ঈশ্বরের দশটি আদেশ 'টেন কমান্ডমেন্ট্স' সঙ্গে নিয়ে ঘুরি না। কোনো উপজাতির ইতিহাসে, কোনো দেশের ইতিহাসে, কোনো শহরের ভিতরকার শহরের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মুহূর্তে সেগুলোকে কাজে লাগাই না। এরা চুরি করেছে এবং এটা চুরি। যখন ওদের হাউজ অফ লর্ডসের একগুচ্ছ পার্লামেন্ট সদস্য চুরি করে জেলে যায়, তখন আমি কোনো হৈচৈ করি না। ওদের মধ্যে অনেকে চোর বলে আমি গণতন্ত্র সম্পর্কে কোনো কটুকাটব্য করি না। অতএব বরিসের লোকেদের এত কলঙ্ক, কারণ আমরা তো সবাই তাঁর নাগরিক। কিন্তু তুমি শুধু একজনের দিকে তাকাবে এবং তাদের ব্যাপারে একটা বিশেষ সুরে কথা বলবে। কিন্তু বরিস হচ্ছে বরিস।

অ্যামি গুডম্যান : লন্ডনের মেয়র।

ডার্কাস হাউই : খুবই উচ্চশিক্ষিত মানুষ, তিনি গ্রিক সভ্যতা খুব ভালোবাসেন এবং সেই সভ্যতার সব কিছুই খুব ভালোবাসেন। কিন্তু বরিসের তো আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কারণ পরের বছর অলিম্পিকের আসর বসবে লন্ডন শহরের ভিতরেই।

অ্যামি গুডম্যান : এবার আমি রিচার্ড সেমোরকে বলব 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ক্যারোলিন ডেভিসের লেখা সম্পর্কে কিছু বলতে। ক্যারোলিন লিখেছেন, 'গত এগারো বছরে পুলিশ হেফাজতে বা হেফাজত থেকে বেরিয়েই ৩৩৩ জন মারা গেছে। কিন্তু কোনো পুলিশ অফিসারের এতটুকু শাস্তি হয়নি।' এটা সরকারি হিসেব। অন্য একটি সমীক্ষায় বলেছে, '১৩ জন অফিসারের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা বা দুর্ব্যবহারের জোরালো সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা সত্ত্বেও তাদের একজনও দোষী সাব্যস্ত হয়নি।' এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগারো বছরে ৩৩৩ জন মানে মাসে দুজনেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে পুলিশি হেফাজতে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। রিচার্ডের মতে এর তাৎপর্য কী?

রিচার্ড সেমোর : হ্যাঁ। আমি বলব। প্রথমত, গত এক প্রজন্ম ধরে পুলিশ ও কালো মানুষদের মধ্যে বিরোধ দূর করার কিছু প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও ব্রিটেনে প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবৈষম্য রয়ে গেছে। 'লরেন্স তদন্ত'–এ এই সত্য উদ্‌ঘাটন হলেও এই বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলেই অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের দাঁড় করিয়ে যখন তখন তল্লাশি, হেনস্থা, হিংস্রতা এবং পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

তবে শুধু পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা বললেই চলবে না। পুলিশি হেফাজতের বাইরেও কতকগুলো জঘন্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। যেমন, 'জি২০' মহাসম্মেলনে প্রতিবাদের সময় ইয়ান টমলিনসনের মৃত্যু এবং শিল্পী স্মাইলি কালচারের মৃত্যু। পুলিশের বক্তব্য হল, স্মাইলির বাড়িতে ড্রাগ বা নেশার জিনিসের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাতে গেলে স্মাইলি নিজেই তাঁর রান্নাঘরে নিজেকে ছুরি মারেন। আমার মনে হয় না কেউ একথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু এর প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ উপায়েই এলাকার বাসিন্দারা বেশ বড়ো আকারের বিক্ষোভ দেখায়। সত্যি বলতে কি, এসব ঘটনাগুলোকে মিডিয়া একেবারেই গ্রাহ্য করে না। এগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ। কিন্তু মিডিয়া এগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

এবং এর ফলে দাঙ্গাকে একটা খুব আশ্চর্য আলোয় দেখা যায়। কারণ, এক বিক্ষুব্ধ যুবককে জনৈক সাংবাদিক যখন প্রশ্ন করে, 'তুমি কি সত্যি মনে কর যে তুমি যা চাও তা পাওয়ার এটাই সঠিক

রাস্তা?' যুবকটি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ। কারণ আমরা যদি দাঙ্গা না করি, আপনারা আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চাইবেন না।'। একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, একটা মিডিয়া, একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা জনসাধারণের মনে এমনই একটা ধারণা গড়ে তুলেছে যাতে তাদের মনে হয়, যতক্ষণ না তারা জোর করে ওদের নজর জনসাধারণের দিকে ঘোরাচ্ছে, ততক্ষণ তাদের কথায় কর্ণপাত করা হবে না। এই মনোভাবও দাঙ্গার জন্ম দেয়।

অ্যামি গুডম্যান : ডার্কাস, আপনার কেমন বোধ হয়, এই যে দারিদ্র্য-অভাবজনিত হতাশার মনোভাব জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, যা কিনা বর্ণনিরপেক্ষভাবে — আপনি যেমন বলেছেন — গরিব শ্বেতাঙ্গদেরও মনোভাব। অর্থাৎ এটা একটা শ্রেণীর সমস্যা। সেক্ষেত্রে অনেকে যখন এই হতাশ ও ক্ষুব্ধ মুহূর্তের সুযোগে দাঙ্গা করছে, চুরি করছে, তখন আপনার বক্তব্য কী?

ডার্কাস হাউই : শুনুন, আমি বলছি। আমি এক পাক্ষিক পত্রিকায় লিখি। পত্রিকাটা যুক্তরাজ্যের কৃষ্ণাঙ্গদের একমাত্র পত্রিকা। গত সপ্তাহে, যখন মার্ক দুগানের ঘটনা বা অন্য কিছুই ঘটেনি, তখনও আমি এ বিষয়ে লিখেছি। কোনো ঘটনা দেখে লিখিনি। আমার ইতিহাস চেতনা থেকে আমার সত্য অনুমানের ক্ষমতা দিয়ে আমি লিখেছি। আমি লিখেছিলাম, 'অ্যামি ওয়াইনহাউজ[৬] তারায় তারায় ভেসে বেড়াচ্ছে, কর্তাদের কাছে ভেসে যাচ্ছে তার কথা, সে বলছে, 'না। না, না।'' ওটা ছিল এক সতর্কবার্তা। আমি এমন কোনো বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ নই যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। যারা যাদু বা জ্যোতিষ জানে — যাদের পয়সা দিয়ে আপনারা জেনে নেন কাল কী হবে — আমি তাদের দলে নেই। আমি ওটা লিখেছিলাম বিশেষ করে আমার নাতির বলা কথাগুলোর জন্য, আর বিশেষ করে, কথা বলার সময় ওর গলায় যে স্বর বেজে উঠেছিল, তার জন্য। আপনিও বুঝতে পারবেন, যদি আপনি ওর কথা, ওর বন্ধুদের কথা, ওর মা বা আমার বন্ধুদের সন্তানদের কথা শোনেন, সেসব কথার সুরই অন্যরকম। বোঝা যাচ্ছিল যে চাপা দেওয়া ঢাকনাটা ফেটে যাবে আর ফেটে গিয়ে উঠে যাবে অনেক উঁচুতে। তাই আমি একটুও অবাক হইনি।

কারা অবাক হতে বাধ্য? যারা শাসন করে। ওদের পক্ষে এটা থামানো সম্ভব নয়। কারণ ওরা জানেই না কোথায় কী অবস্থা হয়ে আছে। ওরা এমনকী এটাও জানে না যে কালো রঙের কিছু মানুষ আছে। পার্লামেন্টও জানে না ওখানে কী ছিল। যারা ওদের খেয়াল রাখছিল, দেখছিল, যারা সাধারণ মানুষের কথা শুনছিল, তারা জানে ওখানে কী ছিল। 'তোমরা কি কাল দাঙ্গা করতে চলেছ?' — এমন কোনো প্রশ্ন নয়, যে কোনো প্রশ্ন করলেই ওরা ফেটে পড়ত, আপনি বুঝতে পারতেন ওরা কতটা হতাশ। আমি আপনাকে এবং আপনার চ্যানেলের দর্শকদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমি জানতাম কী বিষয় হয়ে উঠছে। পুলিশ কিন্তু জানত না। যখন 'ট্রাইডেন্ট' (অপারেশন ট্রাইডেন্ট) দুগানকে হত্যা করল, আমি অবাক হইনি। অন্য কাউকে হত্যা করলেও হতাম না। আমি অবাক নই যে ওরা আরও অস্ত্র চালাবে। পথে পথে অস্ত্র হাতে পুলিশ। স্বাভাবিক সময়ে যত সশস্ত্র পুলিশ থাকে তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। সবাইকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। কোথাও হয়তো গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে।

অ্যামি গুডম্যান : বলুন, আপনার অনুভূতির কথা বলুন —

ডার্কাস হাউই : আমি অবাক হচ্ছি না যে আমরা যারা মুখ খুলছি তাদের ফোনে ওরা আড়ি পাতছে। আমি এতেও অবাক হব না, যদি এরপর রাস্তায় বেরোলে ওরা অন্যদের ছেড়ে আমারই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আবার এক গল্প ফেঁদে বসে। এরকম অবস্থার মধ্যেই আমরা এখন আছি।

অ্যামি গুডম্যান : ডার্কাস, এখন কী হলে ভালো হয়? কীভাবে আজকের সমস্যার সমাধান হবে বলে আপনার মনে হয়? চারদিনের বিদ্রোহ, দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ এবং হাজার জনেরও বেশি মানুষের গ্রেপ্তারি নিয়ে আমরা কথা বলছি। লন্ডন এবং অন্যান্য শহরে এত পুলিশ নামার ঘটনা ইতিহাসে নেই। এখন কী করা দরকার বলে আপনার মনে হচ্ছে?

ডার্কাস হাউই : এখন কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের কাছে অবশ্যই 'শান্তি'র প্রস্তাব দিতে হবে। এটা করা সম্ভব, যদি প্রধানমন্ত্রী অপারেশন ট্রাইডেন্ট বন্ধ করবেন বলে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন। অপারেশন ট্রাইডেন্ট ও অপারেশন রেজরব্যাক বাতিল করতে হবে। এগুলোই বর্তমানে কৃষ্ণাঙ্গদের সন্ত্রস্ত করে রাখছে।

আর একটা কাজ করতে হবে, কালো মানুষদের মধ্যে যারা সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী আছে, তাদের সঙ্গে নিয়ে সবাই মিলে আগামী ছ'মাসের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকে বর্তমান সামাজিক অবস্থাটা তুলে ধরতে হবে। সেখানে অবশ্যই আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপস্থিত থাকতে হবে। পৃথিবীর সব জায়গার সাংবাদিকদের সেখানে উপস্থিত করতে হবে। এই যে একটা সভ্যতার মধ্যে আরেকটা সভ্যতা রয়েছে, তার ভবিষ্যত নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করতে হবে। আমরা আফ্রিকা থেকে, ক্যারিবিয়ান (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) থেকে প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাব। আমরা জানাব, ক্যামেরন যে দেশকে নিয়ে গর্ব করে এটা সেই দেশ নয় — এখানে উপরিতলের নিচে, প্রধানত বর্ণগত প্রশ্নে কীভাবে সন্ত্রাস আর অবহেলার চোরাস্রোত বয়ে চলেছে, আমাদের তার সমাধান করতে হবে। আমাদের এই সমাধান করতেই হবে এবং তা সুসভ্য উপায়েই করতে হবে।

অ্যামি গুডম্যান : আমরা তাহলে এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি ...

ডার্কাস হাউই : লর্ড্স, পার্লামেন্ট বা আপনাদের পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে গিয়ে অথবা সেই ধরনের কিছু করে কোনো লাভ নেই। আমরা আমাদের কথাগুলো এমন উঁচুতে তুলে ধরব যাতে সমস্ত সভ্য জগৎ জানতে পারে। ওরা আফগানিস্তানে যা করছে, এখানেও তা-ই করছে সাধারণ মানুষকে খুন করার জন্য। আমি ক্রুদ্ধ নই, কিন্তু আপ্রাণ আন্তরিক। যখন আমি রাস্তায় হাঁটি, প্রত্যেকবার চারদিকে খালি তাকিয়ে তাকিয়ে নজর রাখি কোথায় দুর্বৃত্ত পুলিশ অফিসারেরা ঘাপটি মেরে রয়েছে। আমি আমার সন্তান এবং নাতিনাতনিদের ওদের থেকে সতর্ক থাকতে বলি। ...

অ্যামি গুডম্যান : আপনাকে ধন্যবাদ, এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।

---

৬ ২৩ জুলাই ২০১১ প্রখ্যাত গায়িকা এবং সঙ্গীত রচয়িতা ২৭ বছর বয়সি অ্যামি ওয়াইনহাউজের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে লন্ডনে তাঁর নিজের বাড়িতে। তাঁর সম্পর্কে মৃত্যুর আগে 'বেআইনি মাদক' সেবনের সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

দুর্নীতির লজিক

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পটা ছিল অনেকটা এইরকম : এক রাজা ঠিক করলেন দুধের পুকুর বানাবেন, তবে সমবায় প্রথায়। সবাই মিলে বিশাল গর্ত কাটবে আর প্রজারা এসে অমাবস্যার রাত্তিরে ঐ গর্তে এক ঘটি করে দুধ ফেলে দিয়ে যাবে। চমৎকার বন্দোবস্ত।

কিন্তু, পরদিন সক্কালে উঠে দেখা গেল দুধের পুকুর তৈরি হয়নি, হয়েছে জলেরই পুকুর। কেন? সব্বাই ভেবেছেন, তাঁর পাশের বাড়ির লোকটি 'ভালো' লোক — সে তো দুধ ফেলবেই, তাহলে আমি যদি এক ঘটি জল ফেলি, তাহলে কে আর টের পাবে?

সব্বার ভাবনাই যদি এমনটি হয়, দায়িত্বের ভার যদি প্রতিবেশীর হাতে ছেড়ে দিই, তাহলে সমবেত চুক্তির আর কোনো মানে থাকে না — এরকম দুধে-জলে জল মেশানোর পরিণামই বেড়ে যায়।

এ অংকটা ছোটোবেলায় আমরা কষেছি, অনুপাতের অংক! দুই বিশ্ব এক হওয়ার আগে ছোটোবেলায় আমরা এরকম দুধ-জল মেশানোর আর একটা গপ্পো শুনেছিলুম। স্রেফ এনেকডোট্ বা কিস্‌সা যাকে বলে আর কি!

মার্কিনী সাহেবদের সাধ হল সোভিয়েত পড়াশোনার হাল জানার — তাঁরা সোভিয়েত দেশের ইস্কুলে সদলবলে হাজির। তাঁরা দুধ-জলের অনুপাতের অংক কষতে দিলেন ক্লাসের বয়ঃসন্ধি পেরোনো ছাত্রছাত্রীদের। তা সোভিয়েত বাচ্চারা বলল, 'আমরা সবাই মিলে পরামর্শ করে কাজ করি। একটু আমাদের পরামর্শ করতে দিন।' মার্কিনী সাহেবরা ভাবলেন, এটা 'হল কালেকশন'-এর মতো টোকাটুকি নয় তো? বাচ্চারা তাদের আশ্বস্ত করল : এক এক দেশ-কালে এক-এক রকম রীতিরেওয়াজ চালু — আজকের ভালো কালকের মন্দ বা উল্টো হতেই পারে। তা খানিক ক্ষণ পরে, তারা একটা উত্তর এনে হাজির করে। দুধে জল মেশানোর আঁকের উত্তর : 'পুলিশে ধরবে!'

দুধ-জলের পুকুর বা অনুপাতের আঁকে আমরা একটা ব্যাপার এড়িয়ে যাচ্ছি কিন্তু! ব্যাপারটা 'গরু' রচনাতেও অনুপস্থিত। মানুষকে নিরন্তর দুধের জোগান দিতে গিয়ে বেচারা গরু-বাছুরের কী হাল হয়? এ প্রশ্নটা করতেই আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। অ-'ন্যায়' করেছি কি? গরু দুগ্ধদায়িনী তখনই হবে, যখন সে গর্ভধারণ করবে। কতবার গর্ভধারণ করবে? মানুষের ইচ্ছে-অনুযায়ী যতবার পারে, ততবার — যতক্ষণ না এতবার গর্ভধারণের ফলে তার মৃত্যু হচ্ছে! আর বাছুর যে দুধ পেল না? না, নানান দুধের মিষ্টি, আইসক্রিম খেতে খেতে বা গুজরাতের সফল দুগ্ধ সমবায় প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করার সময় এসব 'তুশ্চু' ব্যাপার আমাদের মনে থাকে না।

ব্যাপারটা এবার একটু বড়ো করে ভাবা যাক্। প্রকৃতিতে কি এত্তো সম্পদ আছে যা আমরা এরকম ভাবে দোহন করে নিতে পারি? পৃথিবী গ্রহের ভাঁড়ার অফুরন্ত নয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদ্ বলেন, এসবে না কি একমাত্র মানুষেরই স্বত্বাধিকার আছে! ব্যাপারটা সামলাতে প্রয়াত নিসর্গবিদ অনিল আগরওয়াল চমৎকার একটা ধারণা দিলেন, 'নৈসর্গিক স্বত্বাধিকার'(Ecological Entitlement)। ব্যাপারটা খোলসা করে বলি। আমি ঈষৎ টেন্সিত, কেননা আমি জেনে গেছি পৃথিবীতে এত্তো সম্পদ নেই, অথচ মনের মধ্যে লোভ-লালসা রিপু চাগিয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াতেই হবে যেন-তেন-প্রকারেণ। তাই আমার পাশের জন আমার সহযোগী নয়, প্রতিযোগী! তৈরি হল অপর-হিংসে, ভালো কথায় 'মাৎসর্য'। একে খতম করো। আর একটু আগ বাড়িয়ে ভাবলুম, যে সব আম জনতা আছে, তাদের খতম করি, ভাগিদার কমবে। তাই যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও আমার ঘাটতি নেই — প্রতি মানুষের জন্য দুটো বুলেট আপাতত বরাদ্দ করলুম। এদিকে নিসর্গকে লুটে পুটে শুধু ছারখারই করলুম না — একে এমন বদলে দিলুম যে প্রলয়কাল (গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে মানুষের কারণেই হচ্ছে — এ তো আপনারা জানেন!) উপস্থিত হল। আমিস্বয়ং তার থেকে ছাড় পাব কি?

টাকা-ঝাড়া, ঘুষ-নেওয়া ইত্যাদি আদতে রোগলক্ষণ বা symptom। এই নৈসর্গিক স্বত্বাধিকারের বাটোয়ারার ওপরেই কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে চলতি বাংলা/হিন্দি 'করাপশান' (হা, হা — এটা এখন 'ভারতীয়' শব্দ!) কথাটা। কিন্তু, দার্শনিকরা (যাঁরা এখন প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতি!) প্রশ্ন তুলবেন, 'কাকে তোমরা প্রতিমান বা norm হিসেবে সাব্যস্ত করো? কোন প্রতিমান থেকে টস্‌কে গেলে সেটা অনৈতিক ক্রিয়া হয়? প্রতিমান তো দেশ-কালে বদলায়!'

এত্তো শক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার গুরুভার থেকে বাঁচার তাগিদে বা করাপশানের সংজ্ঞার্থ ঠিক করার কঠিন কাজ এড়াতে বরং একটা চুটকি বলি। তাহলে ঐ নৈসর্গিক স্বত্বাধিকার আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি-পাপের খেইটা ধরা যাবে। এক রাজনৈতিক নেতা তাঁর নামে-বেনামে যত্ত সম্পত্তি দেশে বিদেশে আছে, তার একটা হিসেব কষতে বসলেন অডিটরকে সঙ্গে নিয়েই। অডিটর সম্পত্তি হিসেব করে বললেন, "আপনার যা আছে স্যার, তাতে সাত-'পুরুষ' অনায়াসে চলে যাবে।" অষ্টম-পুরুষের কী হবে, তা ভেবে ঐ নেতার হৃদয়-আক্রান্ত হয়, তিনি মুচ্ছো যান।

নেতাটিকে যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বলে মনে হচ্ছে। তিনি পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল। একজনের প্রতি দায়িত্বশীল হলে অন্যজনের প্রতি দায়িত্বশীল তিনি নাও হতে পারেন। কিন্তু নৈসর্গিক স্বত্বাধিকার আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির গাঁটছড়াটা তো বোঝা গেল, নাকি?

আজকাল গণমাধ্যমের দৌলতে নানান কেলেংকারির খবর পড়তে পড়তে বা দেখতে দেখতে খেয়াল করছি, আমাদের কমবেশি জানা এই ব্যাপারটায় তিনটে ঘটনা ঘটছে : (অ) ভ্রষ্টাচার/দুর্নীতির খবরের বাড়বাড়ন্ত। এটাকে আমরা বলব দুর্নীতি-খবরের প্রমুখন (foregrounding); (আ) একই সঙ্গে আবার দুর্নীতি-খবরের প্রমুখবন্ধ (foreclosure); (ই) এই সব খবর শুনে/দেখে বা না-শুনে-দেখে আমরা এবার দুধ পুকুর-বানানোর কিস্‌সা-মোতাবেক

এসব ঘটনাকে যুক্তিসিদ্ধ করে নিই, পরিভাষায় বলব, 'Rationalization' বা যৌক্তিকরণ।

(অ) বিষয়ে বলা বাহুল্য। গণমাধ্যমে নানান কুচ্ছোর রসাস্বাদনে আমরা অভ্যস্ত ও আমাদের মগজ এসব ঘটনা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই অভ্যস্তকরণে এবার কাটছাঁটের খেলা চলে : রামদেবের খবরে আমরা যতটা বিচলিত, নিগমানন্দের খবরে নয়। আন্না হাজারে হিরো হওয়ার পর, এক ম্যানেজমেন্ট সংস্থা তাঁকে কোটি টাকার পুরস্কার দেয়। কেউ প্রশ্ন করেননি, এই ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ সংস্থা এই দেদার টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে? এর মধ্যে ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্র-পড়ুয়ার বাবা-মাদের রক্তজল-করা এবং ধার-নেওয়া পয়সাকড়ি 'অসংগত'-ভাবে ঢুকে নেই তো? তারপর ধরুন এই যে নারী-ভ্রূণ হত্যার হার বেড়ে গিয়ে নারী-পুং অনুপাতে ক্যাঁচাল বাধছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ধর্ষণ-সংখ্যা। এ নিয়ে আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। এ তো 'আমার-তোমার পাপ'! এইসব আমাদের নিজেদের না-মোছা ইয়ের দিকে না তাকিয়ে রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির কথা কইছি বড্ডো বেশি। এখানেই সামনে (প্রমুখ) খুলছি এবং বন্ধ রাখছি। সমস্যাজনক প্রশ্ন হল : এই প্রমুখন ও প্রমুখবন্ধের ক্ষেত্রে আমার বা গণমাধ্যমের চয়নের রাজনীতি কী? কার দুর্নীতি বেশি বা কম আপেক্ষিক গুরুত্ব পাবে, তা আমরা হিসেব করি কী করে?

এই হিসেব করার ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা এখন একটা প্রবাদপ্রতিম বাক্য ব্যবহার করছি যৌক্তিকরণ-প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে — 'এরকম তো কতই হয়।' এক কেন্দ্রীয় স্বয়ংশাসিত বিদ্যে-প্রতিষ্ঠানের এক দীর্ঘদিন পদোন্নতি না-পাওয়া নিম্নবর্গীয় অধ্যাপকের ক্ষেত্রে আর এক উচ্চবর্গীয় অধ্যাপক যখন বলেন, 'তাতে কী হয়েছে, এরকম উদাহরণ আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভুরি ভুরি আছে।', তখন বুঝতে পারি (তথাকথিত) দুর্নীতির যৌক্তিকরণ কদ্দূর এগিয়েছে। আমরা দুর্নীতিতে অভ্যস্তই (habituated) শুধু হইনি, যৌক্তিকরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এবং নিজেও কচুগাছ কাটতে শুরু করেছি — শুধু নিজের দিকে তাকিয়ে, নিজের আয়নায় নিজের মুখ দেখে বলিনি, 'আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।' নাহ্, এ' গান এখন চলবে না, বরং অটোয় বসে শুনছি বাবা লোকনাথের গান, লিরিক মনে নেই, তবে মোদ্দা কথা হল, তুমি যতই 'পাপ' করো না কেন, বাবা লোকনাথ আছেন সামলে দেবেন। এই প্রভুকে কলমা দিয়ে আত্ম-পাপমোচনের ভক্তিভর রাজনীতিতে প্রার্থনা 'শক্তি'-নির্ভর : 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই।' ভগবান খুন হয়ে গেছেন (নীৎসে বলেছিলেন বটে), কিন্তু প্রভুর পায়ে প্রাণমন সঁপে দিয়ে একটাই প্রেরণাবাক্য এখন : 'চালিয়ে যাও গুরু, তুমি মাল ঝাড়তে যদি না পারো, তবে তুমি আস্ত মেদা।'

'মন-মুখ এক করতে হয় রে শালা।', কয়েছিলেন এক পুরুতমশাই; কার্যগতিকে 'পোগতিশীল' 'আধুনিক'-আমি এই পুরুতমশাইকে যেমন বর্জন করেছি, তেমনি তাঁর কথাগুলোও তেমন মন দিয়ে শুনিনি অ-সেকুলার হয়ে যাবার ভয়ে। অথচ এই চাষাদের বুদ্ধিজীবী ঠাকুরমশাই বলেছিলেন, 'সবাই ভাবে তার ঘড়িটাই একমাত্তর ঠিকঠাক চলছে।' তা' আমি যে আমি, যে কিনা মনে করে তার নানান বিষয়ে 'ফান্ডা' (ফান্ডামেন্টাল নলেজ) আছে, মৌলিক জ্ঞানে সে ফাটাফাটি, মূল সত্য এক্কারে বিজ্ঞানের দোর ধরে আবিষ্কার করে ফেলেছে, সে এত্তোগুলো মূল-মৌল-মৌলিকের ফান্ডা ফাটিয়েও কোনোমতেই 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' নয়। কালিভক্ত ঠাকুর ফান্ডামেন্টালিস্ট, তাঁর প্রধান শিষ্য নাকি হিঁদুয়ানির বিগ বস্। উনি মৌলবাদী, আমি নই — আমার ঘড়ি ঠিকঠাক!

এঁদের নিয়ে আমার অবশ্যি তেমন মাথা ব্যথা নেই, কেননা বুর্জোয়াদের 'কালো' হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আমি সদা প্রস্তুত, 'কালো' টাকা সুইস ব্যাঙ্কে কীভাবে জমা হল তা নিয়ে আমার চূড়ান্ত মাথা ব্যথা এবং একই সঙ্গে 'কালো' মানুষ এবং 'কালো' মেয়ের জন্য দরদ উথলে উঠছে। সফেদ পরিসর থেকে আসা আলোকপর্বের জ্ঞানেয়ামি এতই দড় যে খারাপ 'কালো' আর ভালো 'কালো' আমার কাছে গুলিয়ে মুলিয়ে একাকার। মনে আছে ইডেনে নেলসন মান্ডেলার অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আমার এক বন্ধু মায়ের কাছে ফর্সা মেয়ে বিয়ে করার জন্য আবদার করেছিল। তার অনেকদিন পরে এক জনসভায় তাকে একই সঙ্গে বলতে শুনেছিলুম, 'বুর্জোয়াদের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' এবং 'পশ্চিমবঙ্গে পুঁজির বিনিয়োগ নিতান্তই জরুরি ইস্যু।' আবার সেই বাংলা আকাদেমির সভায় সওয়াল করেছে ইংরেজি ব্যাকরণের বিপক্ষে (ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রকল্পের সপক্ষে) আর প্রাথমিক থেকে বাংলা ব্যাকরণ পাঠের সপক্ষে। আবার তাকেই দেখেছি জাতপাতের বিজ্ঞাপনী পৈতে বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে বা শ্রাদ্ধশান্তির আচার-আচরণ পালন করতে ...

এইসব নানান প্যাঁচে, পাঠক নিশ্চিত সমঝে গেছেন আমাদের স/স্ব-পক্ষে বিপক্ষ ঢুকে গেছে শুধু তাই নয়, আমাদের অনেকগুলো ঠিকঠাক ঘড়ি আছে। এতগুলো ঘড়ি আমরা ঠিকঠাক সামলাতে পারি না বলে BT বা 'বেঙ্গল টাইম' বলে একটা কথা চালু আছে।

আরে, আমি বা আমার ঐ বন্ধুর মতো আকণ্ঠ সাহেবি সফেদ জ্ঞান-সত্যে নিমজ্জ ব্যক্তির কথা তো তুশ্চু। স্বয়ং সি. ডি. রমন কী করেছেন? সূর্যগ্রহণের সময় যাবতীয় হিঁদু আচার-আচরণ তিনি যেমন পালন করতেন,তেমনি আবার সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক 'সত্য'-টিও জানতেন। প্রশ্ন হল, এই দুই সি. ডি. রমনের মধ্যে সংলাপ চলত কী করে? একটা উত্তর দিয়েছেন দীপেশ চক্রবর্তী, এসব হল গিয়ে সফেদের আলোকপর্বী একবগ্গা বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে মেকলের বিষবৃক্ষের ফলেদের তীব্র প্রতিক্রিয়া! মনের মধ্যে নানান পার্টিশনস্ — থাকবন্দি জ্ঞান ও তথ্য। এদের মধ্যে অন্তর্জাল রচনা করে প্রজ্ঞার প্রভায় তো পৌঁছতে পারিনি। তাই কাজে-কম্মে মানে থিওরি-প্র্যাক্টিসে সেতুবন্ধ করে উঠতে পারিনি।

এ তো গেল জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু নমুনা। হাতে আংটি, গলায় পৈতে, হাতে তাগা তাবিজ পরে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের সেবকদের সোচ্চার বক্তিমে। বুঝলুম না হয়, এইসব মানুষরা নানান কষ্টে আছেন, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং 'নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস' থেকে জ্ঞান ও কম্মে অমিল ঘটিয়ে ফেলেছেন। এই বিষয় নিয়ে জ্ঞানতত্ত্ব থেকে যদি রাজনীতিতে পাড়ি দিই, তাহলে যেসব উদাহরণ পেশ করতে হবে, তা আপনাদের সবারই জানা। তাত্ত্বিকরা বলেন (যেমন, রাসেল সাহেব) জ্ঞানতত্ত্ব আর নীতিশাস্ত্রে শাসন এক আধারে ঠাঁই পাবে না। বেশ কথা — দুটো আলাদা ব্যাপার। এবার

দেখছি বিশুদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাসেলভক্ত মানুষটি সামান্য চা–বিস্কুটের জন্য কন্‌টিনজেন্সি বিল বানিয়ে ফেলেছেন, যাতে ঐ জলখাবারের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তাঁর গুরু আবার সিয়া–এমআইটি যোগসাজসে সমাজসম্পর্কহীন সস্বচ্ছর মডেলস্‌ জোগান দেন। সেগুলো নিয়ে আমরা, এই এঁদো গলির বৈজ্ঞানিকরা, নানান তথ্য সাজিয়ে দিই। এসব তথ্য ঐ মডেলে খাপ খাইয়ে সফেদ পরিসরে পেশ করলে আমার পদোন্নতি হবে শুধু তাই নয়, দেশের হাঁড়ির খবরও চালান হবে সফেদ–পরিসরে।

যাঁদের কথা কইলুম, তাঁরা দুর্নীতি নিয়ে অত্যন্ত সোচ্চার — অথচ দ্বিচারি আচরণ করছেন ও পয়হা পেঁদাচ্ছেন। ব্যাপারটা কী? বেশি তাত্ত্বিক কথা না ভাটিয়ে বলেই দেওয়া যায়, এসব হল গিয়ে সুবিধেবাদী (অপার্চুনিস্ট) বন্দোবস্ত। যখন যে ঘড়ি দরকার, সেই ঘড়ি ব্যবহার করা — একেই বলে কিনা রণ কৌশল! কীসের রণ কে জানে বাবা!

এত্তোগুলো ঘড়ি থাকার দরুন ব্যাপারটা ঠিক 'দ্বি–চারিতা' বলে অবশ্য পার পাওয়া যাচ্ছে না। বরং বলি, n–চারিতা। n–আখরটি অংকশাস্ত্রে 'অসংখ্য'–কে উপস্থাপিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। n–চারিতার ক্ষেত্রে আমাদের একাধিক প্রতিমান (norms) ঘেঁটেঘুঁটে একাক্কার হয়ে যায়। কিন্তু কেন এমন হয়? স্বয়ং দুর্নীতি করি এবং লোকপাল বিলের ব্যাপারে হাজারেকে সমর্থন করে একটা সই দিয়েই 'পাপ'–মুক্ত হই। কেন এই আত্মপ্রবঞ্চনা?

এমন প্রশ্নের উত্তর এর আগেই একটু আধটু দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু, আর একটু ভালো করে বোঝার জন্য নিজেই ন্যাংটো হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যাই। অন্যকে দোষারোপ করার থেকে নিজের n–চারিতা বুঝে নেওয়া জরুরি। এই নিজেকে দেখা বোঝার 'আত্মানাং বিদ্ধি'–র প্র্যাকটিসটা দীর্ঘদিন অবলুপ্ত। তবু ...

আমি অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত। এ নিয়ে আলোচনার দৌড় অবিশ্যি চায়ের কাপের ধোঁয়া বা ক্যালকাটা ক্লাবের ঠান্ডা ঘর। আমার বাড়ির ঝি থুড়ি কাজের মেয়ের ক্ষেত্রে আমি কী করি? আমার মাগ্‌গি ভাতা বাড়লে, তার মাগ্‌গি ভাতা বাড়াই না। তাঁর জন্য আমার মতো পে কমিশনও বসে না। বছর শেষে ইনক্রিমেন্টও হয় না। আমার বই বা জার্নাল–পেপারে তার নাম উল্লেখ করি না। অথচ তার সাহায্য ছাড়া আমি চলতে পারি না। একথাটা আবিষ্কার করে আর একটু মনের মধ্যে গর্ত খুঁড়লুম। দেখলুম, পাপের অন্ত নেই।

এবং দেখলুম আমার নিজের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যে প্রাথমিক দক্ষতা থাকা দরকার, তার ছিঁটেফোঁটাও আমার ইস্কুল–কলেজি শিক্ষা আমায় দেয়নি। এক, আমি আমার খাবার উৎপাদন করি না — শিশু–বৃদ্ধ–অক্ষমদের জন্য তো নয়ই। আরও ক্যাঁচাল আমার বাঙালি–পুং হিসেবে — নিদেনপক্ষে রান্নাও করতে পারি না! দুই, আমি আমার জামাকাপড় বানাতে পারি না; তিন, আমি ঘরামির কাজও করতে পারি না; চার, এইসব আবশ্যিক কাজ দৈনিক গড়পড়তা আড়াই ঘন্টায় সানন্দে সেরে নিয়ে, তারপর যৌথ নাচ নাচা বা সেতার বাজানো বা ক্ল্যাসিক পড়া ইত্যাদি আমার খুশি মোতাবেক কাজ করার ফুরসৎ–ই নেই আমার। বরং সে সময় গান্ধিয়ান স্টাডিজে একটা ঘ্যাম বক্তিমের খসড়া রচনা করি নাম–খ্যাতি–প্রতিপত্তির আশায়। বলা বাহুল্য, গান্ধি নিয়ে এমন রচনার মহড়ার সময় আমার আবার স্কচ্‌ ও বিড়ির অনুষঙ্গ না থাকলে চলে না। এসময় বেমালুম ভুলে যাই, আমি গান্ধিকে আর একবার খুন করছি।

এইরকম একটা বাঁকে এসে বুঝে গেলুম, আমি হতভাগা একটা প্যারাসাইট বা পরজীবী। প্রচুর মানুষ বাড়তি শ্রম দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে; তাঁদের রক্ত–ঘাম–ক্লেদ আমার n–চারি ফুটানির উৎসমুখ এবং এই বাড়তি শ্রম–ঝাড়া আর পুলিশ–মিলিটারি দিয়ে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণ আমার যাবতীয় দুর্নীতির (কচুগাছ কাটা থেকে ডাকাত হওয়া পর্যন্ত) মোদ্দা কারণ। আর আমার যাপন? সে তো নিসর্গকে ধ্বংস করেই; কেননা আমি যে ঘ্যাম জীবনযাপন করি, তা যদি এই গ্রহের সব মানুষকে সমানভাবে দিতে হয়, তাহলে পৃথিবীর মতো আরও চোদ্দোটা গ্রহে উপনিবেশ বানাতে হবে। এসব গোপন কথা ঢাকতে চাই বলেই সুবিধেবাদী n–চারিতা আমার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গেছে। আমার মতো ন্যাজামুড়োধারীর এত্তো ঘড়ি দেখে আমজনতার সবকিছু গুলিয়ে যায়। আমাদের অতীব নীতিপরায়ণ শিক্ষেব্যবস্থা এটাই চায়। আমার বাথরুমে দুর্গন্ধ, ফিনাইল দিয়ে ঢাকি। ফিনাইলের ব্র্যান্ড নেম : n–চারিতা। আমার এই কনফেশনে বুকে বড়ো ব্যথা হল, পেইন কিলার খাব। সুগন্ধি ফিনাইলে নোংরার গন্ধ যায়, নোংরা যায় না, পেইনকীলারে যেমন পেইনের এন্তেকাল নেই — তেমনই! তাহলে কিং কর্তব্যম্‌? আমার বিচার যে 'তুমি' করবে, সেই তুমিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার ভেতরে–বাইরে কোথাও না! আমার n–চারিতায় 'তুমি' আমার আমিতে লীন হয়ে নেই। শেষ পর্যন্ত কি তবে হৃদয় জুড়োবে মর্গে?

সংযোজন : ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত বছর পাঁচেক পশ্চিমবঙ্গ চল্লিশ–না পেরোনোদের মধ্যে আত্মহত্যার হারে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। n–চারিরা বাঁচার স্ট্রেস্‌ সহ্য করতে পারছেন না।

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

সারা বছরের জন্য চল্লিশ টাকা ডাকযোগে পাঠিয়ে পাক্ষিক এই সংবাদপত্র সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

নীতি–দুর্নীতির পাকেচক্রে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

শমীক সরকার

দুর্নীতি আবার আমাদের দেশের জনমানসে একটা মুখ্য আসন নিয়ে বসে গেছে। আর শোনা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারির মর্যাদা পেতে চলেছে টেলিকম কেলেঙ্কারি বা ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি। ৩জি লাইসেন্স নিলাম করার পর সরকারের কোষাগারে আসে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা। এর তুলনা টেনে বিভিন্ন মহল থেকে হিসেব করে দেখানো হতে থাকে, ২জি লাইসেন্সও যদি এভাবে নিলাম করা হত, তাহলে সরকারের ঘরে আসতে পারত আরও পৌনে দু' লক্ষ কোটি টাকা। সিবিআই তদন্ত করতে নেমে এর মধ্যে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের দুই প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী, এবং কয়েকজন আমলা ও কর্পোরেট কর্তাকে। তিহার জেলে আছে তারা। সওয়াল চলছে সিবিআই কোর্টে। এই ফাঁকে একবার টেলিকম দুর্নীতিটি খতিয়ে দেখে নেওয়া যাক।

টেলিযোগাযোগ

নয়ের দশকে বলা, কম্পিউটার দুনিয়ার বড়ো কারবারি বিল গেট্‌সের কথাটা ছিল, **'ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে'**। কর্পোরেট পুঁজির দুনিয়াদারির সঙ্গে তার অমোঘ যোগাযোগ। পুরোনো পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রের সীমানা, আঞ্চলিকতার সীমানা, বাজারের সীমানা, ছকবাঁধা পুঁজিবাদ ভেঙে ফেলে এক 'স্বাধীন', 'মুক্ত' পুঁজিবাদের যুগের সূচনা হল। মার্কিন দেশে এই ধারণার লিখিত রূপ ছিল এরকম, 'ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে সরাসরি যুক্ত করবে কোটি কোটি মানুষকে, প্রত্যেকেই তথ্যের ভোক্তা এবং নির্মাতা ... ঐতিহ্যবাহী বাজারের কোনো ধারণা, যেমন কৃষি–বাজার বা হাট, অথবা যে কোনো ব্যবস্থা — যেখানে ব্যক্তি কম্পিউটার স্ক্রিন বা কোথাও দাম দেখে কিনতে আসবে — ভয়ানক অপর্যাপ্ত এই বিশাল সংখ্যক জটিল বেচাকেনার কাছে।' লিবারালাইজেশন কথাটা তখন খুব চলত, নয়ের দশকের প্রথম দিকে। অর্থাৎ আগল মুক্ত করা। আর সেই সময়ই ভারতে তৈরি হয় জাতীয় টেলিকম নীতি ১৯৯৪। সেই নীতিকথা শুরু হচ্ছে এই কথাগুলি আউড়ে :

> *বিশ্ববাজারে ভারতের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা এবং রপ্তানির দ্রুত বৃদ্ধির জন্য সরকার নয়া অর্থনৈতিক নীতি নিয়েছে। এছাড়া আরও একটি কারণ হল, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং দেশি লগ্নি বাড়ানো। এই নীতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানের টেলিকমিউনিকেশন পরিষেবা। তাই এদেশের টেলিযোগাযোগ পরিষেবার উন্নতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।*

সরকারের কোষাগার এই লক্ষ্য পূরণে পর্যাপ্ত ছিল না। প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত তেইশ হাজার কোটি টাকা। আর এর জন্য সেই ১৯৯২ সালের জুলাই মাস থেকেই বেসরকারি লগ্নির জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল ৮টি পরিষেবা, নীতিমালা উদ্ধৃত করলে যা দাঁড়ায়, " ক) ইলেক্ট্রনিক মেল; খ) ভয়েস মেল; গ) ডাটা সার্ভিস; ঘ) অডিও টেক্সট সার্ভিস; ঙ) ভিডিও টেক্সট সার্ভিস; চ) ভিডিও কনফারেন্সিং; ছ) রেডিও পেজিং এবং জ) সেলুলার মোবাইল টেলিফোন।"

এর মধ্যে প্রথম ছ'টি পরিষেবা দিতে পারে যে কোনো ভারতীয় কোম্পানি। তারা স্বীকৃত একটি লাইসেন্সের মাধ্যমে তা করতে পারে এবং সেই লাইসেন্স স্বতন্ত্র কিছু নয়। কিন্তু শেষ দুটি, অর্থাৎ রেডিও পেজিং এবং সেলুলার মোবাইল টেলিফোন সার্ভিসের ক্ষেত্রে টেন্ডারের ভিত্তিতে মনোনীত দুটি কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হবে। এই মনোনয়ন হবে কোম্পানির ছ'টি দিক বিবেচনা করে, যার মধ্যে রয়েছে তার ট্র্যাক রেকর্ড, প্রযুক্তি প্রভৃতি। ছোটোখাটো এই নীতিমালায় এর বেশি কিছু ছিল না।

টেলিফোনিক প্রযুক্তি

টেলিযোগাযোগের বিবর্তন বুঝতে হলে টেলিফোন প্রযুক্তিটির বিবর্তন একটু না জানলেই নয়। সেলফোন আসলে প্রযুক্তিগতভাবে একটি উন্নতমানের রেডিও ভিন্ন আর কিছু নয়। আমরা সবাই জানি, ল্যান্ডলাইন টেলিফোনে তার লাগে। তার দিয়ে বাড়ি থেকে পাড়ার ফোনবক্সে সংযোগ করা থাকে। সেই ফোনবক্স থেকে তারের মাধ্যমে বার্তা যায় স্থানীয় এক্সচেঞ্জে। কিন্তু সেলফোন বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তিগতভাবে আলাদা। রেডিওতে যেমন তরঙ্গ বাহিত হয়ে কথা পৌঁছে যায় রেডিও সেটে, সেলফোনেও তাই। এ যুগে সেলফোন আসার আগে ছিল ওয়াকি টকি বা ওয়ারলেস রেডিও, যা সাধারণত ট্রাফিক পুলিশদের বা পুলিশের হাতে আমরা দেখে থাকি।

ওয়াকি টকি বা ওয়ারলেস রেডিও একটি 'হাফ ডুপ্লেক্স ডিভাইস'। অর্থাৎ যে দু'জন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, তারা একই কম্পাঙ্কের তরঙ্গে (সহজ করে বললে, একই তরঙ্গে) কথা বলছে। ফলে একজন যখন কথা বলছে, তখন সে কিছু শুনতে পাবে না; অর্থাৎ অন্যজন তখন কিছু বলতে পারবে না, বললে শোনা যাবে না। তাই ওয়ারলেসে কথা বলার সময় কথা বলা শেষ হলে 'ওভার' বলা হয়, জানিয়ে দেবার জন্য, আমার কথা বলা শেষ, এবার তুমি বলতে পারো। সেলফোন একটি 'ফুল ডুপ্লেক্স ডিভাইস', অর্থাৎ একটি তরঙ্গে কথা বলা হয়, আরেকটিতে শোনা হয়। তাই একইসাথে কথা বলাও যায়, শোনাও যায়।

এছাড়া এই রেডিও ফোনের ক্ষেত্রে সাধারণত শহরে একটিই অ্যান্টেনা থাকে। এবার একজন যখন একটি ফোনে কথা বলে, তখন তাকে খুব শক্তিশালী একটা 'ট্র্যান্সমিশন' (অর্থাৎ উচ্চ ক্ষমতার তরঙ্গ, যা পাঠাতে বেশি বিদ্যুৎশক্তি লাগে) পাঠাতে হয়, যা ওই অ্যান্টেনাতে ধরা পড়তে হবে। সেখান থেকে তা যাবে রিসিভারের কাছে।

রেডিও ফোন হোক বা সেলফোন, একই কম্পাঙ্কের তরঙ্গ একইসাথে দু'জনের ব্যবহারে প্রযুক্তিগত সমস্যা আছে। ধরা যাক, একই তরঙ্গের দুটি রেডিও সিগনাল পাঠানো হচ্ছে দুই জায়গা থেকে। সেক্ষেত্রে, গ্রাহক সেই তরঙ্গে রেডিও সেটটিকে নিয়ে গিয়ে হয় কিছুই শুনতে পাবে না, অথবা এই দুই তরঙ্গের অনুরণনে বিচ্ছিরি কিছু জিনিস শুনতে পাবে। তাই প্রযুক্তিগতভাবেই এক কম্পাঙ্কের একটিই তরঙ্গ ছাড়া প্রয়োজন।

রেডিও ফোনে গোটা শহরটাতে একটাই অ্যান্টেনা, কিন্তু সেলফোনের ক্ষেত্রে গোটা শহরকে ছোটো ছোটো সেল–এ ভাগ করে নেওয়া হয়। একেকটা সেল–এর কেন্দ্রে থাকে একেকটা টাওয়ার (অ্যান্টেনা)। সেলফোন খুব কম শক্তিশালী ট্র্যান্সমিশন পাঠায়, তা সেলফোনটি যে সেল–এ আছে, বড়ো জোর তার ঠিক গায়ে লাগা সেলগুলিতে পৌঁছতে পারে। প্রতিটি ষড়ভুজাকার সেল ঘিরে থাকে আরও ছয়টি সেল। একটি (আসলে একজোড়া, বলা–শোনা) কম্পাঙ্কের ট্রান্সমিশন যে সেলফোন থেকে করা হচ্ছে, সেই সেল এবং তার লাগোয়া আরও ছ'টি সেল ওইসময় আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। ওই ৭টি বাদে বাদবাকি সেলগুলি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। প্রসঙ্গত, প্রযুক্তির দিক থেকে এই কম শক্তিশালী ট্র্যান্সমিশন আরও একদিক দিয়ে সুখকর। এতে ছোটো ব্যাটারিতেই সেলফোনের কাজ হয়ে যায়। তাই সেলফোনের আকৃতিও ছোটো করে দেওয়া গেল।

এখন ধরা যাক, প্রতিটি সেলফোন পরিষেবা–প্রদানকারী কোম্পানি ১ মেগাহার্জ বা ১০ লক্ষ ৫৭৬টি কম্পাঙ্ক পেয়েছে। এর মধ্যে ৫৭৬টি ব্যবহার হয় ফোন কোম্পানির নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশাবলী পরিবহণের জন্য, কথোপকথনের জন্য পড়ে থাকে ১০ লক্ষ কম্পাঙ্ক। ধরা যাক, মানুষের আওয়াজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হওয়ার জন্য একযোগে ১০ হাজার কম্পাঙ্কের তরঙ্গমালা লাগে। সেক্ষেত্রে, ২০ হাজার কম্পাঙ্ক নিয়ে তৈরি হয় একটা ডুপ্লেক্স চ্যানেল (দশ হাজার বলার, দশ হাজার শোনার কম্পাঙ্ক)। ১০ লক্ষ কম্পাঙ্ক এরকম (১০ লক্ষ/২০ হাজার =) ৫০টা চ্যানেল তৈরি করতে পারে। প্রতি ৭টি সেল ওই ৫০টা কথোপকথনের চ্যানেল ভাগাভাগি করে নেবে। অর্থাৎ, একেকটি সেলের ভাগে পড়বে প্রায় (৫০/৭ =) ৭টি কথোপকথনের চ্যানেল। অর্থাৎ, দাঁড়াচ্ছে যে, একেকটা সেলের মধ্যে ৭ জন একসাথে কথা বলতে সক্ষম। সেলফোনে প্রথমদিকে যখন 'অ্যানালগ' প্রযুক্তি ছিল (প্রথম যুগের বা ১ জেনারেশন বা ১জি মোবাইল), তখন এইরকমই দাঁড়াত হিসেবটা। এখন সেলফোনে ডিজিট্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার হয় (অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগ বা ২জি, আমাদের চেনা ডিজিট্যাল প্রযুক্তি জিএসএম, সিডিএমএ)। এখন হিসেবটায় একটু হেরফের হলেও মোটের ওপর একইরকম থাকে। প্রসঙ্গত, কম্পাঙ্কের ইংরেজি হল ফ্রিকোয়েন্সি আর স্পেকট্রামের বাংলা তরঙ্গমালা। এখানে ধরে নেওয়া যেতে পারে, একটা কম্পাঙ্কের একটাই তরঙ্গ হতে পারে। অনেকগুলো পাশাপাশি কম্পাঙ্ক অর্থাৎ অনেকগুলো পাশাপাশি তরঙ্গ মিলে তৈরি হয় তরঙ্গমালা।

যাই হোক, এবার একটি অঞ্চলে গ্রাহকসংখ্যা বেড়ে গেলে, প্রাথমিকভাবে সেল–ঘনত্ব (অর্থাৎ টাওয়ার–ঘনত্ব) বাড়িয়ে নিলেই হল। কিন্তু একসময় দেখা যায়, আর সেল বাড়ানো যাচ্ছে না। বেশি ঘন ঘন সেল করলে লাগোয়া ছ'টি সেল ছাপিয়ে চলে যেতে পারে ট্রান্সমিশনের প্রভাব। তাতে একটি সেল–এ একসাথে কথোপকথনের সর্বোচ্চ চ্যানেল সংখ্যা (আগের উদাহরণে যা ৭) কমে যেতে বাধ্য। তখন প্রয়োজন আরও বেশি পরিমাণ কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ বা তরঙ্গমালা।

রেডিও যোগাযোগের কাজে ব্যবহারযোগ্য কম্পাঙ্ক ৩ কিলোহার্জ থেকে ৩০০০ গিগাহার্জ। এক গিগাহার্জ = (প্রায়) ১০০০ মেগাহার্জ = (প্রায়) ১০০০ x ১০০০ কিলোহার্জ। এই সীমার বাইরের কম্পাঙ্কগুলি সাধারণত এক্স রে, ইনফ্রা রেড রে, গামা রে প্রভৃতি। এর মধ্যেও নিরাপদ সীমা হিসেবে ৯ কিলোহার্জ থেকে ১০০০ গিগাহার্জ কম্পাঙ্ক তরঙ্গমালা বা স্পেকট্রাম ব্যবহার করার আন্তর্জাতিক অনুমতি থাকলেও যন্ত্রপাতি দুর্মূল্য বলে ১০০ গিগাহার্জ কম্পাঙ্কর নিচে থাকা রেডিও তরঙ্গকেই টেলিফোনিক প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয়। এই রেডিও কম্পাঙ্ক আমাদের দেশে ব্যবহার হয় পাবলিক টেলিযোগাযোগ পরিষেবা, নৌ/আকাশ নিরাপত্তার কাজ, রাডার, ভূকম্প–বিষয়ক সমীক্ষা, রকেট এবং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন, ভূ–গর্ভ অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ইত্যাদিতে। আমাদের দেশে এরকম ৪০টি কাজে এই রেডিও কম্পাঙ্ক ব্যবহার হয়। এই তরঙ্গমালা যে কেউ যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারে না, তা বেআইনি। যেমন যে কেউ যা খুশি তরঙ্গে রেডিও স্টেশন খুললে তা বেআইনি। তাই প্রয়োজন হয় স্পেকট্রাম বা তরঙ্গমালা বরাদ্দ করার, যার দায়িত্বে প্রাথমিকভাবে আছে দেশের সরকার। অন্তত সেরকমই ভাবা হয়।

সেলফোন প্রযুক্তি নিয়ে আরেকটু বলা যাক। একজন একই সেলফোন নিয়ে মাইলের পর মাইল চলে গেলেও তার কথোপকথন বন্ধ হয় না। এক সেল থেকে অন্য সেল–এ সে সরতে থাকে। প্রসঙ্গত, প্রতিটি শহরে প্রতিটি সেলফোন পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানির একটি কেন্দ্রীয় অফিস (এমটিএসও) থাকে। কেউ যখন ফোন করে, তখন সেই অফিস দেখে নেয়, সেলফোনটি কোন সেল–এ আছে, এবং সেটা দেখে তার জন্য একটা কথোপকথনের চ্যানেল নির্দিষ্ট করে দেয়, এবং সেটা তাকে ও ওই সেলের টাওয়ারটিকে জানিয়ে দেয় (এই জানিয়ে দেওয়াটা হয় পূর্বে উল্লিখিত ৫৭৬টি নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশাবলী পরিবহণের কম্পাঙ্ক মারফত)। যতক্ষণ না এটা হয়, ততক্ষণ মোবাইলে লেখা থাকে, কানেকটিং।

যদি যে কোম্পানির ফোন, সেই কোম্পানির টাওয়ার না থাকে, তাহলে অন্য যে কোম্পানির টাওয়ার থাকে, সেই টাওয়ারের আওতায়, সেলের আওতায় এবং ওই কোম্পানির কেন্দ্রীয় অফিসের আওতায় চলে আসে সেলফোনটি। যদি ফোনটি স্থান বদল করে চলে আসে এমন এক জায়গায়, যেখানে পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানির কোনও পরিষেবা নেই, অন্য কোম্পানির পরিষেবা আছে, তাহলে রোমিং–এ চলে যায় সেলফোনটি।

অ্যানালগ প্রযুক্তির মোবাইলে স্পেকট্রাম বা তরঙ্গমালা বেশি লাগে। অ্যানালগ সিগন্যাল পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাঁজ করে চালান করা যায় না। ফলে গলার আওয়াজ বা সিগন্যাল পরিবহণের জন্য বেশি জায়গা লাগে, অর্থাৎ বেশি কম্পাঙ্ক লাগে (ওপরের উদাহরণে একযোগে দশ হাজার পরিমাণ কম্পাঙ্ক লাগার কথা আছে)। ফলে প্রাপ্ত কথোপকথনের চ্যানেল সংখ্যা কমে যায়। অতএব এল ডিজিট্যাল প্রযুক্তি। ডিজিটাল ফোন আমাদের গলার আওয়াজকে এক এবং শূন্যতে ভেঙে নেয়। তারপর সেটাকে ভালো করে ভাঁজ করে নিতে পারে। এতটাই যে, একটা অ্যানালগ সিগন্যালের যে জায়গা লাগে, তাতে তিন থেকে দশটা ডিজিটাল সিগন্যাল ধরে যায়। পরবর্তী ডিজিটাল প্রযুক্তি, যেমন টিডিএমএ (যা জিএসএম মোবাইলে থাকে), সিডিএমএ — এগুলোতে আরও কম কম্পাঙ্কে বেশি কথোপকথনের চ্যানেল পাওয়া সম্ভব। সিডিএমএ প্রযুক্তিতে

সিগন্যালগুলিকে আলাদা করে ভাঁজ করে প্যাকেটে প্যাকেটে বিভক্ত করে এমনকী বিভিন্ন কম্পাঙ্কতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় নির্দিষ্ট একটি নাম্বার লিখে, যাতে পরবর্তীতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এভাবে চ্যানেল না বাড়লেও, সেই একই পরিমাণ চ্যানেল ব্যবহার করে আরও বেশি লোক যাতে একইসঙ্গে কথোপকথন চালাতে পারে, তার বন্দোবস্ত করা যায়।

জিএসএম এবং সিডিএমএ প্রযুক্তির পার্থক্য আরও একটু বোঝা দরকার, পরে কাজে লাগবে। প্রথমত, সিডিএমএ প্রযুক্তিতে একটা টাওয়ারেই (অর্থাৎ একটা সেল) যে পরিমাণ জায়গা কভার করা সম্ভব, জিএসএম-এ তার জন্য ৪ থেকে ৫টা টাওয়ার (অর্থাৎ সেল) লাগে। এর ফলে আপাত দৃষ্টিতে সিডিএমএ তে প্রাথমিক পরিকাঠামোগত খরচ কম। কিন্তু এটা আরেক দিক দিয়ে অভিশাপ। সে কথায় পরে আসছি। দ্বিতীয়ত, প্রতি সেল-এ একসাথে কতজন কথা বলতে পারে? তার পরিমাপেও সিডিএমএ এগিয়ে। ১০ মেগাহার্জ কম্পাঙ্ক বরাদ্দ থাকলে, একটি জিএসএম প্রযুক্তির মোবাইল পরিষেবায় একটি সেল-এ যতজন কথা বলতে পারে, তার অন্তত চারগুণ লোক একসাথে কথা বলতে পারে সিডিএমএ প্রযুক্তির পরিষেবার একটি সেল-এ। অর্থাৎ, সিডিএমএ প্রযুক্তির পরিষেবার তরঙ্গমালা ব্যবহারে দক্ষতা বেশি। তাই হয়ত ভারত সরকার জিএসএম পরিষেবার জন্য বরাদ্দ করেছিল প্রাথমিকভাবে ৪ মেগাহার্জ কম্পাঙ্ক, আর সিডিএমএ-এর জন্য ২.৫ মেগাহার্জ কম্পাঙ্ক। এই দুই ক্ষেত্রে সেলপিছু যুগপৎ কথোপকথনের সর্বোচ্চ সংখ্যা প্রায় সমান। কিন্তু সিডিএমএ প্রযুক্তিতে সেল-এর আয়তন অনেক বেশি হওয়াটা সমস্যার জন্ম দেবে। ধরা যাক, একটি ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে যুগপৎ কথোপকথনের সর্বোচ্চ সংখ্যা এলাকার আয়তন পিছু অনেক বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে সিডিএমএ পারবে না, জিএসএম পারবে। সিডিএমএ-কে হাল ছেড়ে দিতে হবে, ইচ্ছে মতো সেলসংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া যায় না। সিডিএমএ উঠে যাবে, কারণ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় লোকে সিডিএমএ মোবাইল ছেড়ে দেবে। কিন্তু হালকা জনবসতি অঞ্চলে সিডিএমএ জিএসএম-এর চেয়ে অনেক লাভজনক, পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানিদের কাছে। তৃতীয়ত, সিডিএমএ-তে মোবাইল হ্যান্ডসেট-এর একটি কোড-এর সাহায্যে সিগন্যাল রিসিভ করা হয়, তাই সিগন্যালের অংশ মাঝপথে খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা জিএসএম-এর তুলনায় কম। ফলে সিডিএমএ মোবাইলে আওয়াজ অনেক পরিষ্কার শোনা যায়।

যে পরিষেবা জিএসএম এবং সিডিএমএ এই দুই-ই দিতে সক্ষম, তাকে বলে ডুয়াল টেকনোলজি বা দ্বৈত প্রযুক্তি। এখনকার যে কোনো পরিষেবাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির পাশাপাশি অ্যানালগ প্রযুক্তিরও বন্দোবস্ত থাকে, যাতে কোনও অ্যানালগ পরিষেবার সেল-এ ঢুকে মোবাইল অচল না হয়ে যায়।

কিন্তু প্রযুক্তির এত দক্ষতাবৃদ্ধির পরেও, গ্রাহক বেড়ে গেলে শেষ পর্যন্ত খোঁজ পড়ে বেশি কম্পাঙ্ক বরাদ্দের। গ্রাহক বৃদ্ধি পিছু কম্পাঙ্ক বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যাপারে ভারত সরকার প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রযুক্তিগত উল্লম্ফনের ওপর দাঁড়িয়ে কর্পোরেটদের সক্রিয়তা এবং ভারত সরকারের টেলিকম নীতি কীভাবে বদলেছে তার আলোচনা এবার করা হবে।

দেশের টেলিকম বা টেলিযোগাযোগ নীতিমালা

১৯৯৪ সালের জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিতে সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্ক চারটি মেট্রো সিটিতে চালু হয়েছিল, কিন্তু তা প্রত্যাশা মতো প্রসারিত হচ্ছিল না। ফলে যে কর্পোরেটগুলি সেলুলার পরিষেবার জন্য লাইসেন্স পেয়েছিল, তারাও লাভ করতে না পেরে হতোদ্যম হয়ে পড়ছিল। নতুন টাওয়ার বসানোর ব্যাপারে তারা পিছিয়ে আসছিল, ফলে পরিষেবার মানও উন্নত করা যাচ্ছিল না। তা গ্রাহক আকর্ষণ করতে আরও ব্যর্থ হচ্ছিল। এর ওপরে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা লাইসেন্সের শর্ত মোতাবেক ফি হিসেবে দিয়ে যেতে হচ্ছিল, তা সে লাভ হোক আর না হোক। ফলে কোম্পানিগুলি মোবাইলের খরচ কমালো না। গ্রাহক সংখ্যাও বাড়ল না। এ যেন এক দুষ্টচক্র। সব মিলিয়ে ১৯৯৪ সালের নীতি ব্যর্থ হচ্ছিল। ১৯৯৯ সালে এই কারণেই আরেকটি টেলিকম নীতিমালার দরকার পড়ল। তাতে ১৯৯৪ সালের নীতির পর্যালোচনা করে বলা হল, 'লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এমন ৬টা সার্কেলের মধ্যে মাত্র ২টিতে বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারীরা মাত্র সীমাবদ্ধ আকারে প্রাথমিক টেলিকম পরিষেবা শুরু করেছে। ফলে ১৯৯৪ সালের জাতীয় টেলিকম নীতিমালায় যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তার অনেকগুলিই পূরণ হয়নি। ১৯৯৪ নীতিতে যা ভাবা হয়েছিল তার তুলনায় অনেক ধীর গতিতে বেসরকারি ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে'।

ক) ১৯৯৯ সালের নয়া টেলিযোগাযোগ নীতি

১৯৯৯ সালের নীতিমালায় অনেকগুলি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল : আইটি, টেলিকম, মিডিয়া, কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স — এইসব প্রযুক্তির মধ্যে বিভাজন আর থাকছে না, তাই প্রয়োজন আরও উন্নত পরিকাঠামো; 'স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্টে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা অর্জন করা'; 'ভারতীয় টেলিকম কোম্পানিগুলিকে সত্যিকারের গ্লোবাল প্লেয়ার করে তোলা।'

সেলুলার মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই ১৯৯৯ নীতিমালায়। প্রথমত, তার লাইসেন্স পাওয়া পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে সে সমস্ত ধরনের মোবাইল পরিষেবা দিতে পারে, ভয়েস মেসেজ, টেক্সট মেসেজ, ডাটা পরিষেবা ...। দ্বিতীয়ত, নিজের এরিয়ার মধ্যে দূর সঞ্চার লাইনের (long distance telephone) নিজস্ব বন্দোবস্ত করে নিতে পারে। তৃতীয়ত, পাশাপাশি এরিয়ার লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগের নিজস্ব বন্দোবস্তে কোনো বিধিনিষেধ নেই। চতুর্থত, নিজের এরিয়ার পরিকাঠামো অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীর সঙ্গে সে ইচ্ছে মতো 'শেয়ার'ও করতে পারে। পঞ্চমত, ইচ্ছে মতো সে ভিএসএনএল-এর কায়দায় 'সরকারি' কোম্পানির পরিকাঠামোও ব্যবহার করতে পারে। এখানে এরিয়া বা ক্ষেত্র হল গোটা দেশের মধ্যে একেকটি টেলিফোনিক প্রদেশ। মোটামুটি একেকটা রাজ্য মানে হল একেকটা টেলিফোনিক প্রদেশ। এছাড়া আছে চারটে মেট্রো সিটি। ১৯৯৯ সালের নয়া টেলিকম নীতিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। ১৯৯৪ সালের নীতিতে ছিল, যে কোম্পানি লাইসেন্স নেবে, তারা এককালীন দশ বছরের জন্য নেবে এবং তার জন্য তাদের বছর বছর ভাড়া গুনতে হবে, সে লাভ হোক বা না-ই হোক। ১৯৯৯ সালের নীতিতে ঠিক হয়, লাইসেন্স পেতে একটা এনট্রি

ফি দিতে হবে। তারপর মোট আয়ের (adjusted gross revenue) একটা শতাংশ (৬–১৫ শতাংশ) প্রতি চারমাস অন্তর লাইসেন্স ফি হিসেবে এবং যে স্পেকট্রাম ব্যান্ড সে পাচ্ছে, তার জন্য দিতে হবে। আয়ের শতাংশের হিসেবে ভাড়া নেওয়ার ফলে কোম্পানিগুলির মধ্যে একটা উৎসাহ আসে। এছাড়া, একেকটা সার্কেলে যে দু'টি করে কোম্পানির একচ্ছত্র ছিল, তার বদলে সরকার প্রয়োজন মতো বেশি সংখ্যক কোম্পানিকেও লাইসেন্স দিতে পারে।

খ) দূরসঞ্চার লাইন কর্পোরেটদের হাতে যাওয়ার নীতি

২০০০ সালের আগস্ট মাসে সরকার (ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন) একটি গাইডলাইন ইস্যু করে জাতীয় দূর সঞ্চার লাইন (সাদা বাংলায় এসটিডি পরিকাঠামো) কর্পোরেটদের জন্য ছেড়ে দেয়। কতজন লাইসেন্স পেতে পারে সে বিষয়ে কোনো সীমা রাখা হয়নি। ঠিক হয়, সমস্ত ধরনের ল্যান্ডলাইন, সেলুলার বা কেব্‌ল পরিষেবাকারীরা বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় দূরসঞ্চার লাইসেন্সধারীকে ইন্টারকানেকশন দেবে। এক্ষেত্রে এই লাইসেন্সধারী অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে নিজস্ব বন্দোবস্ত করে নিতে পারে। একইসাথে বিভিন্ন লাইসেন্সধারীদের মধ্যেও বন্দোবস্ত হতে পারে। এই লাইসেন্সে এনট্রি ফি ছিল ১০০ কোটি টাকা এবং চারটি ফেজ–এ সারা ভারতে তাদের পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতি ফেজ–এর জন্য ১০০ কোটি টাকা করে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি রাখার কথা বলা ছিল।

২০০৪ সালের জুন মাসে একটি সংযোজনী ইস্যু করে এই ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির পরিমাণ কমিয়ে আনা হয় ২৫ কোটি টাকায়। এতে একটা ধারা ছিল, লাইসেন্স ফি দিতে দেরি হলে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির ঋণের ওপর সুদের হারের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি সুদ নেওয়া হবে। ২০০৫ সালের মার্চ মাসের একটি সংযোজনীতে এটা কমিয়ে ২ শতাংশ বেশি নেওয়ার কথা বলা হয়। তাছাড়া, লাইসেন্স ফি দিতে দেরি হলে, ফাইনের মোট পরিমাণও কমানো হয় দুই–তৃতীয়াংশ। বদলে, সাধারণভাবে মোট ৫০ কোটি টাকা ফাইনের কথা বলা হয়। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সংযোজনী দিয়ে লাইসেন্সপ্রাপক ও লাইসেন্সের আবেদনকারী কোম্পানিতে মোট বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৪ শতাংশ করা হয়, অর্থাৎ সোজা করে বললে, বিদেশি মালিকানার কোম্পানির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর ব্যবহারযোগ্য পুঁজির সর্বনিম্ন পরিমাণ ধার্য হয়েছিল ২৫০ কোটি টাকা, তা কমিয়ে করা হয় ২.৫ কোটি টাকা। আবেদনকারীর অ্যাসেট–এর সর্বনিম্ন মূল্য ২৫০০ কোটি টাকা থাকার কথা ছিল, এবারে তা তুলে দেওয়া হল। প্রতিটি ফেজ–এর জন্য কমিয়ে করা ২৫ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবার তুলেই দেওয়া হয়। এতদিন পর্যন্ত মূল গাইডলাইন অনুসারে বার্ষিক লাইসেন্স ফি ছিল মোট আয়ের ১৫ শতাংশ। এই সংযোজনীতে বলা হয়, ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তা হবে মোট আয়ের ৬ শতাংশ, অর্থাৎ নয় শতাংশ কমানো হয়। লাইসেন্স পাওয়ার সাত বছরের মধ্যে সারা ভারতে পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়ার সময়সীমাও তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখন থেকে সারা ভারতে পরিকাঠামো নির্মাণ করার বাধ্যবাধকতা থাকল না। বিশেষত অলাভজনক গ্রাম এলাকায় পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে দূরে থাকা গেল। সেখানে অন্যান্য অপারেটরের (আইনগতভাবে সরকারি এবং বেসরকারি, বাস্তবত গ্রাম্য এবং দুর্গম এলাকায় সরকারি) পরিকাঠামো বোঝাপড়া করে নিয়ে ব্যবহার করার স্বাধীনতা থাকল। এইভাবে কর্পোরেটদের পক্ষে সরাসরি অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনকভাবে গাইডলাইন বদলানো হল।

২০০৬ সাল পর্যন্ত দূরসঞ্চারে প্রাইভেট কর্পোরেট ছিল মাত্র তিনটি, এয়ারটেল, রিলায়েন্স এবং টাটা (২০০২–এর মধ্যেই এরা লাইসেন্স নিয়েছিল)। আর ছিল সরকারি বিএসএনএল (এরাও কিন্তু কর্পোরেট, ২০০০ সালে বিএসএনএল কর্পোরেট হিসেবেই জন্মেছিল, যার সিংহভাগ শেয়ার সরকারের)। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ধামাকাদার সংযোজনীর পর ২০০৬ সালের প্রথমদিকে তিনটি সরকারি কোম্পানি — এমটিএনএল, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন এবং ভারতীয় রেল টেল কর্পোরেশন (এবং পরে ২০০৭–এ জাতীয় গ্যাস কোম্পানি অয়েল ইন্ডিয়া) লাইসেন্স নেয়, যার অর্থ, তাদের দেশজোড়া পরিকাঠামো নেটওয়ার্ক প্রাইভেট কোম্পানিগুলির জন্য খুলে দেওয়া হল। অর্থাৎ ডাবল ধামাকা। এরপর লাইসেন্সের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে কর্পোরেটদের আর দেরি হয়নি। ২০০৬ সালেই আটটি কর্পোরেট (এইচসিএল, বিটি গ্লোবাল, টিউলিপ, লুপ টেলিকম, এটি অ্যান্ড টি, ভোদাফোন, সিফি, আইডিয়া এবং ডিশনেট), ২০০৭ সালে তিনটি (বিটি, টাটা, স্পাইস), ২০০৮ সালে ছ'টি (ভেরিজোন, ইকুয়ান্ত, সোয়ান, সিটিকম, সোয়ান), ২০০৯ সালে তিনটি (সিংটেল, ডাটাকম, ইউনিটেক) কর্পোরেট লাইসেন্স নেয়। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক দূরসঞ্চার লাইনের ক্ষেত্রেও একই রকমের সংযোজনী ইস্যু করা হয়েছিল। শুধুমাত্র দূরসঞ্চার লাইনের বার্ষিক লাইসেন্স ফি আয়ের ১৫ থেকে ৬ শতাংশে নিয়ে আসার কারণে প্রতি বছর সরকারের কমপক্ষে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা করে ক্ষতি হয়েছে।

গ) আরও কর্পোরেটদের সেলুলার লাইসেন্স প্রদান নীতি

১৯৯৯ নয়া টেলিকম নীতি অনুযায়ী ৪টি মহানগর এবং আরও তেরোটি সার্কেলের জন্য ২টি অপারেটরের লাইসেন্সের পাশাপাশি আরও একটা লাইসেন্স সরকার রেখেছিল সরকারি কোম্পানির জন্য। চতুর্থ অপারেটর (অবশ্যই বেসরকারি) ঢোকানো হয় ২০০১ সালে। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ট্রাই–এর (টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া) পরামর্শ মতো প্রতিটি সার্কেলের জন্য একটি করে লাইসেন্স, অর্থাৎ মোট সতেরোটি লাইসেন্স ছাড়া হয়। এই লাইসেন্সের মধ্যেই ছিল, কতটা করে স্পেকট্রাম এক একজন পাবে, তার শর্ত। আলাদা করে স্পেকট্রামের জন্য নিলাম করতে হয়নি। কেবল লাইসেন্স–ই দেওয়া হয়েছিল, এককালীন এনট্রি ফি–র ওপর নিলাম করে। ২০০১ সালেই বেস বা ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের জন্য ২৫টি লাইসেন্স ছাড়া হয়েছিল।

কিন্তু আস্তে আস্তে বেস টেলিফোন আর লাভজনক থাকছিল না। মোবাইল ফোন সংযোগ বাড়ছিল হুহু করে আর মোবাইল ফোনের কল চার্জ বেস টেলিফোনের কলচার্জের কাছাকাছি চলে আসছিল। ভয়েস ওভার ইন্টারনেট বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেলিফোন পরিষেবা প্রযুক্তির আমদানির ফলে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছিল। দূরসঞ্চার লাইন (জাতীয় বা আন্তর্জাতিক) বাস্তবত কোনো আলাদা পরিষেবা হিসেবে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিল। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কারণেই এইসব পরিষেবাগুলির অকাল পতন

হতে পারে। যেমন, সেলুলার পরিষেবা WLL বা বেস টেলিফোনের কাছাকাছি এলাকায় বিনা তারে পরিষেবার পতন ঘটিয়ে দিচ্ছিল। তখন যারা টাকা খরচ করে ওইসব পরিষেবার লাইসেন্স নিয়েছে, তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। এইসব আশঙ্কা প্রকাশ করে ট্রাই ২০০৩ সালে সামগ্রিক একটি লাইসেন্স প্রথার সুপারিশ করেছিল। বেস ফোন এবং সেল ফোন পরিষেবা একটি লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রসঙ্গত বলে দেওয়া ভালো, আগে প্রতিটি লাইসেন্সের জন্য আলাদা নিয়মকানুন এবং লাইসেন্স ফি ছিল। সামগ্রিক একটি লাইসেন্সে আলাদা আলাদা লাইসেন্স ফি এবং নিয়মকানুন থাকল না।

ট্রাই-এর ২০০৩ সালের এই সুপারিশটি দেখার মতো। এতে চীনের মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যার সঙ্গে ভারতের গ্রাহক সংখ্যা তুলনা করে একটা সম্ভাব্য গ্রাহক সংখ্যা দেখানো হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল, WLL এবং সেলুলার ফোন দুই-ই থাকবে। দুই-ই বাড়বে সমান তালে। বলা হয়েছিল, মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা '১০০ মিলিয়নে' (১০ কোটি) পৌঁছতে গেলে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা দরকার। কিন্তু এত টাকা কোথায়? এখনও পর্যন্ত দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি মোবাইল কোম্পানিগুলোকে ৮৪৮০ কোটি টাকা পুঁজি দেবার কথা বলেছে, তার মধ্যে ২৬৬৪ কোটি টাকা এখনও দিতেই পারেনি। পুঁজির অভাবে বাজারের চাহিদা মেটানো যাবে না, এ তো খুব খারাপ ব্যাপার! লাইসেন্সের এনট্রি ফি কত হবে? সুপারিশটিতে বলা হল, ২০০১ সালে চতুর্থ মোবাইল অপারেটর ঢোকানোর সময় লাইসেন্স নিলাম করে যে এনট্রি ফি ঠিক হয়েছিল, তা-ই রাখতে। এখন আবার নিলাম করা হবে না কেন? ট্রাই একটি যুক্তি দিল বটে, জাস্ট বলল, তাতে দেরি হয়ে যাবে!

২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক মন্ত্রীগোষ্ঠী ট্রাই-এর প্রস্তাবিত ইউনিফায়েড অ্যাকসেস সার্ভিস লাইসেন্স (UASL) মঞ্জুর করল। ১৯৯৯ সালের টেলিকম নীতির পর এটা সরকারি টেলিকম নীতির এক উল্লেখযোগ্য বাঁক। ২০০৩ সালের ১১ নভেম্বর ইস্যু করা হল এই গাইডলাইন, যাতে নয়া ইউএএস লাইসেন্সের ব্যাপারে কিছু বলা নেই, কেবল বলা হল, বিভিন্ন লাইসেন্সধারীরা কীভাবে নয়া লাইসেন্স জমানায় আসবে। আর ১৯৯৯ সালের নয়া টেলিযোগাযোগ নীতিমালায় যুক্ত হল এক পাতার একটি সংযোজনী। তাতে বলা হল, 'সাধারণভাবে জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে ভোক্তাদের স্বার্থে ...' এই সামগ্রিক লাইসেন্স প্রথায় যাওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায় কারা আছে, এ ব্যাপারে যারা খোঁজখবর করেন, তাদের জন্য খবর, তখন এনডিএ সরকার। বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। আর ক'মাস পরে ভোট।

এই গাইডলাইনে স্পষ্ট বলা হল, এই 'লাইসেন্সের (এনট্রি) ফি, পরিষেবা এলাকা, প্রসারের বাধ্যবাধ্যকতা এবং ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি' হবে ২০০১ সালে চতুর্থ সেলুলার অপারেটর ঢোকানোর সময় যা যা ছিল, তাই। যারা আগের লাইসেন্সগুলির কোনো একটা পেয়েছে, তারা ইচ্ছে হলে এই নয়া লাইসেন্স প্রথায় চলে আসতে পারে। যাদের সেলুলার লাইসেন্স ছিল, তারা বিনে পয়সায় এই লাইসেন্সে চলে আসতে পারবে। আর যাদের কেবল বেসফোন লাইসেন্স ছিল, তাদের বাড়তি ফি-টুকু দিতে হবে। একই পরিষেবা ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রাপকরা নিজেদের মধ্যে মার্জার, অ্যাকুইজিশন বা লাইসেন্স ট্র্যান্সফার করতেই পারে, যদি সেই পরিষেবা ক্ষেত্রে মোট তিনজনের চেয়ে বেশি অপারেটর থাকে। এসবই প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য করা হল। প্রতিটি লাইসেন্সধারী, জিএসএম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ২X৪.৪ মেগাহার্জ এবং সিডিএমএ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ২X২.৫ মেগাহার্জ করে কম্পাঙ্ক পাবে লাইসেন্সের সাথে। পরে গ্রাহক সংখ্যা বাড়লে এই প্রাপ্য বাড়তে পারে। কিন্তু মোটের ওপর তা জিএসএম-এর ক্ষেত্রে ২X৬.২ মেগাহার্জ এবং সিডিএমএ-র ক্ষেত্রে ২X৫ মেগাহার্জের বেশি হবে না। মোট ১৯টা সেক্টর এবং চারটি মহানগর, সর্বমোট ২৩টি এরিয়াতে দেওয়া হল এই লাইসেন্স। এরিয়াগুলির জন্য ক্যাটেগরি করা হয়েছিল ২০০১ সালেই, এ, বি এবং সি। এ ভাগে ছিল মহানগর এবং কিছু অধিক জনঘনত্বের এরিয়া, বি ভাগে তার চেয়ে কম ঘনত্বের কিছু এরিয়া এবং সি ভাগে দুর্গম এরিয়াগুলি। এ, বি এবং সি ভাগের জন্য লাইসেন্স ফি, অর্থাৎ মোট আয়ের শতাংশের পরিমাণ ভিন্ন হতে থাকে। প্রসঙ্গত, এই লাইসেন্সে গ্রাম্য এরিয়াতে পরিষেবার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা ছিল না। নিজে পরিকাঠামো তৈরি না করে অন্যান্য লাইসেন্সধারীর পরিকাঠামো সমঝোতা করে নিয়ে ব্যবহারের ব্যাপারেও এতে সম্মতি ছিল।

লাইসেন্স ফি হিসেবে মোট আয়ের শতাংশ সরকারকে দেওয়ার ব্যাপারে শতাংশটির পরিমাণ কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে, তা দেখা যাক। প্রথমে সেলফোন অপারেটরদের প্রদেয় ছিল ১৫ শতাংশ। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে তা কমিয়ে করা হয় এ, বি ও সি এরিয়ার জন্য ১২, ১০ এবং ৮ শতাংশ। ট্রাই-এর ইউএএস সুপারিশটিতেও এই হারই দেওয়া ছিল। প্রাথমিক গাইডলাইনেও তাই ছিল। পরে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সংশোধিত গাইডলাইনে তা কমে হয় ১০, ৮ এবং ৬ শতাংশ। একইভাবে কমানো হয় ব্যাঙ্ক গ্যারান্টিও। পারফরমেন্স ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দাঁড়ায় ২০, ১০ ও ২ কোটি টাকা এবং লগ্নির ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দাঁড়ায় ৫০, ২৫ এবং ৫ কোটি টাকা।

২৪ নভেম্বর ২০০৩ সালে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক আগে-এলে-আগে-পাবে ভিত্তিতে নয়া ইউএএস লাইসেন্স দেওয়া হবে বলে ঠিক করে। গাইডলাইনে ছিল, লাইসেন্স প্রদান হবে একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু স্পেকট্রাম সবসময় পাওয়া যায় না। স্পেকট্রাম যেমন ডিফেন্স বা অন্যান্য মন্ত্রক থেকে পাওয়া যাবে, সেই মোতাবেক আগে এলে আগে পাওয়া যাবে ভিত্তিতে লাইসেন্স দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ১৯৮০-র দশকে, যখন স্পেকট্রামের কোনো দাম ছিল না, তখন বিনে পয়সায় এই স্পেকট্রামগুলি বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল।

স্পেকট্রামের দাম কত হতে পারে? কত স্পেকট্রাম দেশের কাছে আছে? এ বিষয়ে কোনোদিন কোনো হিসেব করা হয়নি। ২০০৩ সালে ইউএএস লাইসেন্স প্রদানের প্রাকমুহূর্তে সরকারি মন্ত্রীগোষ্ঠী জানায়, এটা অর্থমন্ত্রক এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রক মিলে ঠিক করবে। স্পেকট্রামের দাম কত হতে পারে, তার হদিশ না থাকাটাকেও ইউএএস লাইসেন্সের এনট্রি ফি-র জন্য নিলাম না ডাকার একটা কারণ হিসেবে ট্রাই তার সুপারিশে চিহ্নিত করেছিল।

২০০৫-এর ডিসেম্বরে ইউএএস লাইসেন্সের গাইডলাইন পাল্টানো হল। এটাতে লাইসেন্সধারী কোম্পানিতে বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ

সীমা ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৬ শতাংশ করা হল। এই সীমা বাড়ানোর কথা প্রথম বলা হয়েছিল বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি এবং প্রমোশন ডিপার্টমেন্টের ২০০৫ সালের একটি প্রেসনোটে। লাইসেন্সধারী কোম্পানি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের সম্মতি পেল। নয়া গাইডলাইনে জরিমানার হার প্রভৃতিও কমানো হয়; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দূরসঞ্চার লাইনের ক্ষেত্রে সংযোজনী দিয়ে যে পর্যায়ে কমিয়ে আনা হয়েছিল, এক্ষেত্রেও তার সাথে সমান করে দেওয়া হয়। এতে নয়া লাইসেন্সের জন্য টেলিকম সেক্টরে আগের অভিজ্ঞতা কোনো শর্ত হিসেবে রইল না।

২০০৪ সালে ২৮টি নয়া ইউএএস লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। ২০০৬ সালে দেওয়া হয় ২২টি নয়া ইউএএস লাইসেন্স। ২০০৭ সালে একটা। ইউএএস লাইসেন্স প্রদানের ধারাবাহিকতায় দুর্নীতির স্তরে যাওয়ার আগে অন্য আরও দুটি নীতির স্তরের কাজ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ঘ) স্পেকট্রামের বরাদ্দ বৃদ্ধির নীতি

২০০১ সালে যখন চতুর্থ সেলুলার অপারেটরকে আনা হয়, তখন ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম ঠিক করে, লাইসেন্স ফি বাবদ সরকারের পাওনা কোম্পানির বার্ষিক আয়ের ১৭ শতাংশ। এর মধ্যে স্পেকট্রামের ভাড়া ছিল ২ শতাংশ। এটা ২X৪.৪ মেগাহার্জ স্পেকট্রামের জন্য। যদি তার বেশি নেয় (মোট ২X৬.২ মেগাহার্জ), তাহলে আরও ১ শতাংশ যোগ হবে। ২০০১ সালের ১২ নভেম্বর টেলিকম ডিপার্টমেন্ট একটি আদেশে বলে, ওই বাড়তি ২X১.৮ মেগাহার্জ কম্পাঙ্ক চাইলে কেউ নিতে পারে। ২০০২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি টেলিকম ডিপার্টমেন্ট আরেকটি অর্ডার দিয়ে জানায়, কোনো একটি পরিষেবা অঞ্চলে কোনো অপারেটরের ৫ লাখের বেশি গ্রাহক হয়ে গেলে ২X৬.২ মেগাহার্জের চেয়েও বাড়তি আরও ২X১.৮ মেগাহার্জ কম্পাঙ্ক চাইলে কেউ নিতে পারে। বার্ষিক লাইসেন্স ফি তাতে আরও ১ শতাংশ বাড়বে। টেলিকম কমিশন বা ট্রাই-এর সুপারিশ ছাড়াই, টেলিকম ডিপার্টমেন্ট নিজে নিজেই এই বাড়তি কম্পাঙ্ক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রসঙ্গত, কাকে আগে দেওয়া হবে স্পেকট্রাম? ২৫ জানুয়ারি ২০০১ বেস ফোনের লাইসেন্সের গাইডলাইন ঘোষণা করার সময়ই সরকার বলেছিল, স্পেকট্রাম বরাদ্দ করা হবে আগে-এলে-আগে-পাওয়া-যাবে এই ভিত্তিতে। যাই হোক, এইভাবে, ক্রমে সর্বোচ্চ সীমা করা হয় ২X১০ মেগাহার্জ (স্পেকট্রামের ভাড়া আয়ের ৪ শতাংশ)। ২০০৪ সালে এই সীমা ছাড়িয়ে যায়। সরকার আরও বাড়তি ২X৫ মেগাহার্জ কম্পাঙ্ক বিলির সিদ্ধান্ত নেয়। যারা নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে মোট স্পেকট্রাম ভাড়া হয় আয়ের ৬ শতাংশ। অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর দাঁড়িয়ে এই বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছিল। প্রসঙ্গত, এগুলি সবই টিডিএমএ (জিএসএম) প্রযুক্তির জন্য প্রযোজ্য কম্পাঙ্ক পরিসর। সিডিএমএ-এর বিষয়টি এখানে আলোচিত হল না।

ঙ) ভিএসএনএল নীতি

১৯৮৬ সালে সরকারি কর্পোরেট কোম্পানি হিসেবে ভিএসএনএল বা বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড তৈরি হয়েছিল। কারণ, তখন টাকার দরকার। কর্পোরেট হলে বাজার থেকে টাকা তুলতে পারবে, সরকারি নিয়মনীতি অত কিছু মানার দরকার পড়বে না। ১৯৯২ সালে প্রথম ইকুইটি বেচে দেওয়া শুরু হয়, প্রায় ১৫ শতাংশ শেয়ার বেচে দিয়ে। আস্তে আস্তে কোম্পানির গতরের ৪৯ শতাংশ হয়ে দাঁড়ায় বেসরকারি পুঁজি। টাটাদের ছিল ২০ শতাংশ। ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক দূরসঞ্চার লাইনের লাইসেন্স, যা এতদিন সরকারি সম্পত্তি ছিল, এক কথায় তা ছেড়ে দেওয়া হয় প্রাইভেট পার্টির জন্য। এই আন্তর্জাতিক লাইনটি এতদিন ছিল ভিএসএনএল-এর একচেটিয়া। তাই সরকারকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। কীভাবে? একটি জাতীয় দূরসঞ্চার লাইসেন্স পায় ভিএসএনএল — বিনা পয়সায়। ভিএসএনএল-এর আরও ২৫ শতাংশ শেয়ার সরকার টাটাদের বিক্রি করে দেয়। অর্থাৎ টাটারাই এখন ৭৪ শতাংশ শেয়ারহোল্ডার হয়ে কোম্পানিটির হর্তাকর্তা হয়ে যায়। প্রসঙ্গত ২০০৮ সালে ভিএসএনএল-এর পুরোটাই কিনে নেয় টাটা। এখন আর ভিএসএনএল-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন তার নাম টাটা কমিউনিকেশন।

চ) নীতি আর 'দুর্নীতি'র গোধূলি

আবার ইউএএস লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। ১৭ জুন ২০০৭ থেকে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রকের পক্ষ থেকেই নয়া ইউএএস লাইসেন্স দেওয়া স্থগিত রাখা হয়। কারণ একই পরিষেবা ক্ষেত্রে আর নতুন অপারেটর দেওয়া হবে কিনা এবং লাইসেন্সের শর্ত কিছু পরিবর্তন হবে কিনা, এই বিষয়ে ট্রাই-এর কাছে সুপারিশ চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। ২৮ আগস্ট ট্রাই বলে, যত খুশি নতুন অপারেটর আসতে পারে (no cap)। আরও বলে, বাড়তি স্পেকট্রাম নিতে চাইলে কী শর্ত হবে তা সেলুলার অপারেটরদের সংগঠন, সরকার, স্পেকট্রাম কমিটি, এবং বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা বসে ঠিক করুক। কারণ, পরিষেবা ক্ষেত্রের জনঘনত্বের ওপর নির্ভর করে স্পেকট্রাম কম-বেশি লাগে। এতদিন স্পেকট্রাম দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়নি। সব জায়গাতেই সমান স্পেকট্রাম দেওয়া হয়েছে। একইসাথে জিএসএম ও সিডিএমএ অপারেটররা লাইসেন্সের সাথেই ন্যূনতম প্রাপ্য যথাক্রমে ২X৪.৪ মেগাহার্জ ও ২X২.৫ মেগাহার্জ করে যে স্পেকট্রাম পায়, তা পাবে। তবে বাড়তি স্পেকট্রাম নিতে গেলে তাদের গ্রাহক সংখ্যা এবং পরিষেবার প্রসারের কথা বিবেচনা করতে হবে। ২জি ব্যান্ড, অর্থাৎ এতদিন যে সমস্ত ব্যান্ডের স্পেকট্রাম দেওয়া হয়েছে জিএসএম ও সিডিএমএ অপারেটরদের, সেগুলোর (৮০০, ৯০০ ও ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ড) আশেপাশের ব্যান্ডগুলো বাদ দিয়ে বাদবাকি সমস্ত ব্যান্ড ভবিষ্যতে নিলাম করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ব্যান্ডগুলির আশেপাশে ২X১০ মেগাহার্জ পর্যন্ত ব্যান্ড যারা নিচ্ছে বা নিয়েছে, তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল বার্ষিক আয়ের একটি শতাংশ সরকারকে প্রদান, লাইসেন্স ফি-এর মতো স্পেকট্রাম ফি (২-৪ শতাংশের মতো)। ২X১০ মেগাহার্জের চেয়ে বেশি ব্যান্ড যারা নিচ্ছে, তাদের কাছ থেকে এককালীন এনট্রি ফি নেওয়ার প্রস্তাব করে ট্রাই। তার সাথেই বাড়তি ব্যান্ডধারীদের বার্ষিক দেয় শতাংশ বাড়ানোরও প্রস্তাব করা হয়। একটি প্রযুক্তির লাইসেন্সধারী (পড়ুন সিডিএমএ প্রযুক্তির লাইসেন্সধারী) অন্য প্রযুক্তিতে (জিএসএম) যেতেই পারে, সেক্ষেত্রে সে দ্বৈত প্রযুক্তির লাইসেন্সধারী হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে ওই লাইসেন্স যাদের আছে বা যারা নিতে চলেছে, তাদের সমান পরিমাণ টাকা এনট্রি ফি দিতে হবে। দ্বৈত প্রযুক্তিতে যেতে চাওয়া অপারেটর যখন দ্বিতীয় প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য

বাড়তি স্পেকট্রাম চাইবে, তখন তাকে ওই প্রযুক্তির স্পেকট্রাম পাওয়ার জন্য যে লাইন পড়েছে, সেই লাইনেই দাঁড়াতে হবে।

২৯ আগস্ট ট্রাই-এর এই সুপারিশ পায় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রক। ২৪ সেপ্টেম্বর টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ রাজা ইউএএস লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ঘোষণা করেন, ১ অক্টোবর ২০০৭। পরদিন প্রেস রিলিজ বেরিয়ে যায়। এর আগে ২১ সেপ্টেম্বর ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম একটা আভ্যন্তরীণ কমিটি তৈরি করেছিল ট্রাই-এর সুপারিশটিকে খতিয়ে দেখার জন্য। ১০ অক্টোবর ২০০৭ ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম তড়িঘড়ি টেলিকম কমিশনের পুরোনো সময়ের জনা কয়েক সদস্যকে নিয়ে একটি মিটিং করে ট্রাই-এর no cap সুপারিশটি গ্রহণ করে। ট্রাই-এর সুপারিশ খতিয়ে দেখার জন্য তৈরি হওয়া আভ্যন্তরীণ কমিটি বলেছিল, নয়া লাইসেন্স দেওয়া যেতেই পারে কোনও সীমা না রেখে। কিন্তু স্পেকট্রাম যেন না দেওয়া হয়। স্পেকট্রাম দুর্লভ, তা মাথায় রেখে নয়া লাইসেন্সধারীদের স্পেকট্রাম দেওয়ার আগে ট্রাই এ'নিয়ে একটা নীতি তৈরি করুক। এই মর্মে ট্রাইকে স্পেকট্রাম বিষয়ক সুপারিশটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানোর কথা বলে আভ্যন্তরীণ কমিটি। কিন্তু টেলিকম কমিশন আভ্যন্তরীণ কমিটির এই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। ট্রাই-এর একটি সুপারিশও খারিজ করে এই কমিশন, যেটাতে ট্রাই বলেছিল, যারা কেবল লাইসেন্সটুকু নিতে চায়, কিন্তু প্রাপ্য ন্যূনতম স্পেকট্রাম নিতে চায় না, তাদের জন্য আলাদা লাইসেন্স এনট্রি ফি ঠিক হোক। স্পেকট্রামের দুর্লভ হওয়ার কারণে লাইসেন্স পাওয়া এবং স্পেকট্রাম পাওয়ার বিষয়টিকে আলাদা করার যে পরামর্শ আভ্যন্তরীণ কমিটি দিয়েছিল এবং ট্রাই-এর সুপারিশেও যার আংশিক ইঙ্গিত ছিল, তাকে অস্বীকার করে টেলিকম কমিশন। টেলিকম কমিশনের সিদ্ধান্তে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী সিলমোহর লাগিয়ে দেন ১৭ অক্টোবর ২০০৭। ১৫ অক্টোবর এবং ১৯ অক্টোবর, অর্থাৎ মন্ত্রীর সিলমোহর লাগানোর দু'দিন আগে ও দু'দিন পরে ট্রাই দু'বার দু'টি চিঠি পাঠায় ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমকে। তারা একথা জানায় যে, ট্রাই-এর সুপারিশকে মর্যাদা দেওয়া হোক এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বা কাজ শুরুর আগে ট্রাই-এর সুপারিশ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হোক। এসবকে পাত্তা না দিয়ে ১৯ অক্টোবর ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলে দেয়, দ্বৈত প্রযুক্তিতে যারা যেতে চাইছে, তারা লাইসেন্স ও স্পেকট্রাম পাবে; যে সমস্ত ইউএএস লাইসেন্সধারী ওই দ্বিতীয় ধরনের স্পেকট্রামের জন্য এর মধ্যেই আবেদন জানিয়েছে, তারা স্পেকট্রাম পাবে, আবেদনের তারিখের ভিত্তিতে তাদের সারণিতে রাখা হবে। নয়া লাইসেন্স প্রদান এবং স্পেকট্রাম প্রদান নির্ভর করবে স্পেকট্রামের ভাঁড়ারের ওপর। বাড়তি স্পেকট্রাম যারা চাইছে, তারাও পাবে। অর্থাৎ, স্পেকট্রামের দুর্লভ হওয়ার কারণে এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পেকট্রাম বিলিতে লাগাম টানার কোনো হদিশ ছিল না। একইসাথে আবেদনের তারিখের ভিত্তিতে সারণিতে রাখার কথা বলে আগে-এলে-আগে-পাওয়া যাবে, এইভাবে লাইসেন্স ও স্পেকট্রাম বিতরণের পদ্ধতিকেও সিলমোহর দেওয়া হল।

এরপর ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়টিতে আইনগত মতামত চাইলে, আইন মন্ত্রক ১ নভেম্বর ২০০৭ জানায়, এই গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রীগোষ্ঠী আগে বিবেচনা করুক, তারপর অ্যাটর্নি জেনারেল (আইন মন্ত্রকের অধীন) মতামত দেবে। ২ নভেম্বর টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আইন মন্ত্রকের এই পরামর্শ এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে খারিজ করে দেয় এবং নয়া ইউএএস লাইসেন্স পাওয়ার আবেদনের সময়সীমা ১ অক্টোবর ২০০৭ থেকে পিছিয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ করে দেন। উল্লেখ্য, ওই ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখেই ১ অক্টোবরের সময়সীমাটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। একইসাথে তিনি চলতি পদ্ধতিতে (অর্থাৎ আগে-এলে-আগে-পাওয়া যাবে ভিত্তিতে) নয়া লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া চালু রাখার কথা বলেন। শুধু একটা কথা জুড়ে দেওয়া হয় লাইসেন্সের গাইডলাইনে, লাইসেন্স পেলেই যে স্পেকট্রাম পাওয়া যাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ স্পেকট্রাম পাওয়া যাবে কিনা তা নির্ভর করছে কতটা স্পেকট্রাম ভাঁড়ারে তখন আছে তার ওপর।

৭ নভেম্বর থেকে জমে থাকা আবেদনের ভিত্তিতে নয়া ইউএএস লাইসেন্স ও দ্বৈত প্রযুক্তি লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতি শুরু হয়। ২২ নভেম্বর ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমকে বলে, ২০০১-এর এনট্রি ফি নিয়ে কোনরকম মূল্যায়ন ছাড়াই ২০০৭-এ লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? এ ব্যাপারে যেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। ২৯ নভেম্বর ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকম (সেক্রেটারি ডি এস মাথুরের সই করা চিঠি) উত্তর দেয়। তারা জানায়, যা হচ্ছে তা ক্যাবিনেট ও ট্রাই-এর সুপারিশ মেনেই হচ্ছে (ইউএএস লাইসেন্স বিষয়ে ২০০৩ সালের ক্যাবিনেট ডিসিশন এবং দ্বৈত প্রযুক্তি বিষয়ে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের ট্রাই-এর সুপারিশ)। ৩০ নভেম্বর ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমের ফাইনান্স মেম্বার সেক্রেটারি মঞ্জু মাধবন একটি নোট দিয়ে জানান, আর এগোনোর আগে ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স-এর এই পর্যবেক্ষণটিকে গুরুত্ব দিয়ে এনট্রি ফি পুনর্বিবেচনা করা হোক। ৪ ডিসেম্বর ২০০৭ মন্ত্রী এই নোটের বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে নোট লেখেন। তাতে বলা হয়, 'এইভাবে ফাইলে লাগাতার বাধা সৃষ্টি করা আইনের জ্ঞান বা একাগ্রতা দেখায় না, দেখায় গোপন স্বার্থ (vested interest)'। ২৬ ডিসেম্বর মন্ত্রী নয়া লাইসেন্স প্রদানের পুরো বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে জানান। ৭ জানুয়ারি ২০০৮ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো ওই চিঠিটিকেই লাইসেন্সের বিষয়ে নীতিগত নির্দেশ হিসেবে নেওয়া হয় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রকের তরফে এবং ওইদিনই ওটা সলিসিটর জেনারেল মঞ্জুর করে।

১০ জানুয়ারি দুপুর পৌনে দুটোয় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নীতিগত নির্দেশটি প্রকাশ্যে আনা হয়। সেখানে ইউএএস লাইসেন্স দেওয়া হবে একথা জানানো হয়। ওই ইউএএস লাইসেন্স খতিয়ে দেখা হবে যে আগে আবেদন করেছে, তারটা আগে — এই ভিত্তিতে। খতিয়ে দেখার পর যে আবেদনকারী ইউএএস লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাকে ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমের কাউন্টারে ওই লাইসেন্সের জন্য যা যা জমা দেওয়া দরকার, তা জমা দিতে হবে। তারপর আগে-জমা-দিলে-আগে পাবে ভিত্তিতে ইউএএস লাইসেন্স দেওয়া হবে।

ওইদিনই এক ঘন্টা পরে, দুপুর পৌনে তিনটেয় আরেকটি প্রেস রিলিজ দেয় ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম। তাতে ছিল, ইউএএস এবং দ্বৈত প্রযুক্তির আবেদন যারা করেছিল, তারা সেই আবেদনের বিষয়ে

ডিপার্টমেন্টের মতামত জানতে তাদের প্রতিনিধিকে কোম্পানির স্ট্যাম্প সহ যেন সাড়ে তিনটের মধ্যে নয়া দিল্লির সঞ্চার ভবনের তিনতলায় পাঠায়। সাড়ে চারটের মধ্যে যে আবেদনকারীর প্রতিনিধি আসবেন না, তার আবেদন বিষয়ে ডিপার্টমেন্টের মতামত পোস্টে পাঠানো হবে। যাদের আবেদন যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে, তারা ছুটির দিন বাদে যে কোনোদিন সকাল ন'টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ডিপার্টমেন্টের কাউন্টারে যা যা জমা দেওয়ার তা জমা দিতে পারে।

ওইদিন বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে সঞ্চার ভবনের তিনতলায় যোগ্য বিবেচিত আবেদনগুলি কোম্পানি প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়। ওই দিনই সঞ্চার ভবনের একতলায় চারটে বিশেষ কাউন্টার খোলা হয়, লাইসেন্সের যোগ্য আবেদনকারীর থেকে যা যা জমা নেওয়ার কথা তা জমা নেওয়ার জন্য। দেওয়ালের একটি ডিজিটাল ঘড়িতে সময় দেখে কখন জমা দেওয়া হচ্ছে, তা দাগিয়েও নেওয়া হচ্ছিল। উল্লেখ্য, গোটা ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগে পৌনে দুটো থেকে সাড়ে পাঁচটা। এই সময়টুকুর মধ্যে শুধু সঞ্চারভবনে কর্পোরেটটির প্রতিনিধি পৌঁছনোই নয়, তার সাথে জমা দেওয়ার জন্য প্রতিটি লাইসেন্সের জন্য প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা করে তাকে নিয়ে যেতে হয়েছে।

সাংবাদিক জে গোপীকৃষ্ণনের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছে, কাউন্টারের সারণিতে প্রথমে আসার জন্য কোম্পানি প্রতিনিধিদের মধ্যে মারপিট লেগে গিয়েছিল। কর্পোরেটদের সিইও স্তরের লোকেরা এসেছিল টাকা জমা দিতে, তারা শুধু নিজেদের মধ্যে মারপিট করেনি, টেলিকম অফিসের কিছু কর্মীকেও মারধোর লাগায়। সামলাতে প্রথমে ষণ্ডা এবং পরে পুলিশ আনা হয়। কিন্তু মন্ত্রী এ রাজার ব্যক্তিগত সচিব আর কে চাণ্ডোলিয়ার হস্তক্ষেপে কারোর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়নি।

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২৩২টা আবেদন জমা পড়েছিল এবং ১ অক্টোবরের মধ্যে আরও ৩৪৩টা আবেদন জমা পড়ে, অর্থাৎ মোট ৫৭৫টি আবেদন। তার মধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা পড়া আবেদনগুলিই কেবল যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, এই ২৩২টি আবেদনের মধ্যে ১২২টা লাইসেন্স মঞ্জুর হয়।

দুর্নীতির অভিযোগকারীদের বক্তব্য রাজা এবং তার পারিষদবর্গের একাংশ (যেমন, টেলিকম সচিব সিদ্ধার্থ বেহুরা প্রভৃতি) কর্পোরেটদের একাংশের কাছ থেকে টাকা খেয়ে নিম্নলিখিত বাজে কাজগুলি করেছেন :

১) ট্রাই-এর সুপারিশের পুরোটা না মেনে আংশিকভাবে মানা হয়েছে; ২০০১ সালের লাইসেন্স এনট্রি ফি-র সমমূল্যে ২০০৮ সালে ইউএএস লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ২০০১ সালে মোবাইলের যা প্রসার ছিল দেশে, তাতে তখন মোবাইল ব্যবসা যতটা লাভজনক ছিল, তার তুলনায় তার লাভ ২০০৮ সালে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। তাই এনট্রি ফি-ও অনেক বেশি হওয়ার কথা (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল পরে হিসেব করে বলে, সরকারের ঘরে আসতে পারত আরও এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা)।

২) দ্বৈত প্রযুক্তির আবেদনকারীরা, মূলত রিলায়েন্স এবং টাটা, সিডিএমএ থেকে লাভজনক জিএসএম প্রযুক্তিতে যেতে চাইছিল। তাদের ২০০১ সালের সমমূল্যে এনট্রি ফি নিয়ে ২০০৮ সালে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

৩) ২০০৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয়, ইউএএস লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সময়সীমা ১ অক্টোবর। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর তা পিছিয়ে করা হয় ২৫ সেপ্টেম্বর। এর পেছনে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।

৪) মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে যোগ্য আবেদনকারীদের ১৬০০ কোটি টাকা (ডিমান্ড ড্রাফটে) জমা দিতে বলা হয়েছিল। তার মানে দাঁড়ায়, আগে থেকেই কিছু কোম্পানিকে টাকা তুলে রেডি রাখতে বলে দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিক গোপীকৃষ্ণনের রিপোর্টে অভিযোগ, বিকেল সাড়ে তিনটেয় কাউন্টার খোলার আগেই রাজার ব্যক্তিগত সচিব চাণ্ডোলিয়ার ঘরে বসে সোয়ান টেলিকম এবং ইউনিটেক — এই দুটি কোম্পানির নাম সারণিতে এক এবং দুই নম্বর হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

নীতি-দুর্নীতির সিরিয়ালের কর্পোরেট পরিচালনা

সবচেয়ে সাদা চোখে নীতি-দুর্নীতি গোটাটাই শাসক দলের ব্যাপার, সরকারি ব্যাপার, পার্লামেন্টের ব্যাপার, মন্ত্রকের ব্যাপার, আমলাদের ব্যাপার। নীতি-দুর্নীতির সমালোচনা বিতণ্ডায় এরাই কাঠগড়ায় আসে। কিন্তু আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, টেলিকম নীতির ক্ষেত্রে ট্রাই-এর সুপারিশ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ট্রাই সেসবের মধ্যে দেশের কথা বলতে গিয়ে চীনের কথা টেনে আনে!

ক) ট্রাই

১৯৯৭ সালে তৈরি হয় টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সংক্ষেপে ট্রাই)। প্রথমে এটি একটি সাংবিধানিক বডি হিসেবে গড়ে না উঠলেও, পরে এটাকে সাংবিধানিক বডির স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে এর উল্লেখ আছে, ... যেহেতু আগামী কয়েক বছর বেসরকারি ক্ষেত্র টেলিকম নেটওয়ার্ক নির্মাণে টেলিকম ডিপার্টমেন্ট/এমটিএনএল এর চেয়ে বেশি কাজ করবে, একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রয়োজন, যা সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বেসরকারি মুনাফাকে শিকল পরাতে পারবে।' আর কর্পোরেটদের দিক থেকে ট্রাই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ টেলিকম সেক্টরে সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি কর্পোরেট পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সরকার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলে, তা সরকারি অপারেটরের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কর্পোরেট অপারেটরদের যদি স্বার্থ হানি ঘটায়! ১৯৯৭ সালে তৈরি হওয়া নিয়মাবলী এবং ২০০০ সালের পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে দাঁড়ায়, কখন লাইসেন্স দেওয়া হবে, শর্ত কী কী হবে, প্রযুক্তি, টেলিকম গ্রোথের জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ানো, স্পেকট্রামের এফিসিয়েন্ট ব্যবহার, লাইসেন্স প্রত্যাহার প্রভৃতি ব্যাপারে ট্রাই নিজে থেকে বা সরকারের অনুরোধে সুপারিশ করতে পারবে।

ট্রাই-এর পরামর্শ সরকার মানতে বাধ্য তা নয়, কিন্তু নয়া লাইসেন্স প্রদান ও তার শর্তের ব্যাপারে সরকার ট্রাই-এর সুপারিশ নিতে বাধ্য এবং ট্রাই ৬০ দিনের মধ্যে তা না দিলে সরকার কাউকে ট্রাই-এর সুপারিশ ছাড়াই লাইসেন্স দিতে পারে। ট্রাই-এর সুপারিশ না মানতে চাইলে ট্রাইকে তা জানিয়ে সুপারিশ পরিমার্জন করার জন্য পাঠাতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ট্রাই-এর পরিমার্জিত

সুপারিশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ, লাইসেন্স প্রদান এবং তার শর্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার স্বাধীন নয়। সে ট্রাই-এর সুপারিশ অনুযায়ী চলতে বাধ্য — আইনের স্পিরিটটি কিন্তু তাই। সুপারিশ করা ছাড়াও ট্রাই-এর দায় নিয়ন্ত্রণ, পরিষেবার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করা এবং দাম ঠিক করা। বিভিন্ন অপারেটরের মধ্যে ঝামেলা এবং গ্রাহক-অপারেটরের মধ্যে ঝামেলা মেটানোর দায়ও ট্রাই-এর ছিল প্রথমে, কিন্তু ২০০০ সালে টিডিস্যাট (টেলিকম ডিসপিউট সেট্‌লমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপেলেট ট্রাইবুনাল) গঠন করে তার ওপর এই দায় ন্যস্ত করা হয়।

খ) কর্পোরেট ও তার প্রকাশ্য কার্যকলাপ

উদাহরণ : 'ট্রাই-কে স্বাধীন হতে হবে'

১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে দিল্লি হাইকোর্ট রায় দেয়, দিল্লি এবং বোম্বে শহরে সরকারি সংস্থা এমটিএনএল সেলফোন পরিষেবা দিতে পারবে। এর আগে ট্রাই ফেব্রুয়ারি মাসে সেলুলার ফোন পরিষেবায় এমটিএনএল-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ট্রাই বলেছিল যে, এমটিএনএল ক্ষমতা দেখিয়ে প্রাইভেট অপারেটরদের ব্যবসা থেকে দূর করে দেবে। সরকারি এমটিএনএল, যারা দিল্লি এবং বোম্বেতে ল্যান্ডলাইন পরিষেবা দেয়, তারা সেলুলার পরিষেবায় আসতে চেয়েছিল। কারণ তাহলে প্রাইভেট অপারেটররা মোবাইল কলের (৩২ টাকা/মিনিট) যে চড়া মূল্য রেখেছে, তা কমবে। তাছাড়া ইনকামিং কলের জন্য পয়সা না নেওয়ার কথাও ভাবছিল এমটিএনএল। যাই হোক, হাইকোর্ট বলে, ট্রাই-এর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। ব্যস, শুরু হয়ে যায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কর্পোরেট সেলুলার অপারেটরদের চিৎকার। বিপিএল মোবাইল : 'এটা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে ধাক্কা ... ট্রাই-কে স্বাধীন হতে হবে এবং তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।' ভারতী (পরবর্তীতে এয়ারটেল) টেলিকমের সুনীল মিত্তল : 'টেলিযোগাযোগের লিবারালাইজেশন সম্ভব নয় যদি ট্রাই-এর ক্ষমতা খর্ব করা হয়।' এমটিএনএল এক বছরের মধ্যে কলরেট নামিয়ে আনে তিন মিনিটে এক টাকা চল্লিশ, প্রাইভেট অপারেটররা তখন রেখেছিল ৬ টাকা প্রতি মিনিট। স্বভাবতই রেগে গিয়ে ট্রাই-এর কাছে নালিশ জানায় তারা। ট্রাই এমটিএনএল-এর কম কলরেট-এর প্রস্তাব আগে অনুমোদন না করে ফেলে রেখেছিল, এবার নালিশ পেয়ে সে এমটিএনএল-কে শো-কজ করে : কেন তাদের সম্মতি ছাড়া এত কম কলরেট রাখা হয়েছে।

উদাহরণ : 'প্রতিটি সরকারি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেছি'

টাটা এবং রিলায়েন্স ভারতবর্ষের প্রায় সবক'টি সার্ভিস এরিয়াতে এবং আরও দুটি কর্পোরেট শ্যাম ও ইনফোটেল মাত্র একটি করে সিডিএমএ প্রযুক্তির মোবাইল পরিষেবা দিতে শুরু করেছিল। ফলে জিএসএম প্রযুক্তির লাইসেন্স তারা পায়নি। সিডিএমএ প্রযুক্তি জিএসএম প্রযুক্তির চেয়ে বেশি দক্ষতা সম্পন্ন। কিন্তু স্পেকট্রামের অভাব হচ্ছিল তাদের। ফলে পরিকাঠামো বাড়িয়ে অভাব পূরণ করতে হচ্ছিল। তাতেও ভবিষ্যতে কী হবে বলা যাচ্ছিল না। কারণ জিএসএম-এর জন্য দুটি তরঙ্গমালা ব্যান্ড বরাদ্দ (৯০০ ও ১৮০০ মেগাহার্জ) থাকলেও সিডিএমএ-র জন্য বরাদ্দ ছিল একটি ব্যান্ড (৮০০ মেগাহার্জ)। টাটার এক কর্তার কথায়, 'আমরা প্রসারের জন্য দ্বিগুণ খরচ করেছি, এতে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে ঘা লাগছে। আমরা এটা স্পেকট্রাম বিষয়ক প্রতিটি সরকারি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেছি। ... জিএসএম প্রযুক্তির লাইসেন্স পাওয়া আমাদের কাছে বাধ্যতামূলক'। প্রসঙ্গত, দ্বৈত প্রযুক্তির লাইসেন্স প্রদানে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় এই দুটি কর্পোরেট — এরা বেশিরভাগটাই সিডিএমএ থেকে জিএসএম প্রযুক্তিতে চলে যায়। টাটা গোষ্ঠী দ্বৈত প্রযুক্তি লাইসেন্স পাওয়ার পরই বিদেশি টেলিকম কর্পোরেট ডোকোমো-কে ১৩ হাজার কোটি টাকায় নিজেদের ২৭ শতাংশ ইকুইটি বিক্রি করে দেয়।

উদাহরণ : মামলা

১৯৯৯ সালে যখন বার্ষিক নির্দিষ্ট লাইসেন্স ফি থেকে আয়ের ভাগ দেওয়ার জমানায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নয়া টেলিকম নীতিতে, তখন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে সিপিআইএম বলেছিল, এটা 'সহস্রাব্দের সবচেয়ে বড়ো কেলেঙ্কারি, এতে সরকারের ক্ষতি হবে ৫০ হাজার কোটি টাকা।' এই নীতিতে সরকারি সংস্থার (এমটিএনএল) তৃতীয় সেলুলার অপারেটর হিসেবে জুড়ে যাওয়ার যে নীতি ছিল, তাকে দিল্লি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সেলুলার অপারেটরদের ইউনিয়ন 'সেলুলার অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়া'। পরে তারা সেটা প্রত্যাহার করে নেয়।

উদাহরণ : হামলা

১০ জানুয়ারি ২০০৮ দিল্লিতে সঞ্চারভবনের কাউন্টারের সামনে কর্পোরেট সিইও স্তরের মানুষদের নিজেদের মধ্যে মারপিট এবং টেলিকম দপ্তরের কর্মীদের মারধোর, যার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

এরকম প্রকাশ্য কার্যকলাপ আছে প্রচুর। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া, মামলা, ট্রাই সহ সরকারি কমিটিগুলোকে প্রভাবিত করা প্রভৃতির মাধ্যমে এই নীতি-দুর্নীতির রঙ্গে কুশীলবদের পরিচালনা করা চলে।

গ) কর্পোরেট ও তার গোপন সংগঠন

একটা কোম্পানির নাম বৈষ্ণবী কর্পোরেট কনসালটেন্ট। পরিচয়, কর্পোরেট লবিস্ট। মালিক নীরা রাদিয়া। এই নীরা রাদিয়ার সাথে কিছু সাংবাদিক, কর্পোরেট কর্তা, রাজনীতিবিদের ফোনালাপ ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ট্যাপ করেছিল, ২০০৯ সালের মে-জুন মাসে। মাত্র দুই মাসের ফোনালাপে হদিশ পাওয়া যায় কর্পোরেটের গোপন সংগঠনের। দুনিয়াজোড়া আল কায়দার মতো ছড়ানো কর্পোরেটের গোপন সংগঠনের একটি ধরন হল কর্পোরেট লবিবাজির সংগঠন। তার মধ্যে একটি হল এই নীরা রাদিয়ার সংগঠনটি। এরকম আরও হাজার হাজার হয়ত আছে। ওই ফোনালাপে দেখা যায়, কর্পোরেটেরা তাদের ক্লায়েন্ট আর তারা রাজনীতিবিদ থেকে আমলা, মিডিয়ার লোক থেকে মন্ত্রী, রাজ্যপাল থেকে এনজিও-দের কাছে কর্পোরেটের হয়ে সওয়াল করে। আলোচ্য নীরা রাদিয়ার ক্লায়েন্টদের মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স (মুকেশ) এবং টাটা। টাটা প্রায়শই দাবি করেন, তিনি ঘুষ দেন না। সেই টাটা রাদিয়া টেপ প্রকাশ হবার পর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন, যাতে ওই টেপ প্রকাশ বেআইনি ঘোষিত হয়। টাটাবাবু প্রেসকে জানান, 'আমরা ব্যবসায়ীদের সুযোগের মধ্যে সমতা চাই। আমরা নীতির পরিবর্তন চেয়েছি, কখনও তার (রাদিয়া) মাধ্যমে, কখনও সরাসরি। ... কিন্তু তাকে কখনও ঘুষ দেওয়ার

কাজে ব্যবহার করিনি'! আরেকটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এগুলো তাদেরই সংগঠন!

কী করে এই গোপন সংগঠন? ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের এক অতি গোপন (টপ সিক্রেট) রিপোর্টে (ফাঁস হওয়া) লেখা আছে, 'নীরা রাদিয়া এই সংগঠনগুলির প্রধান : বৈষ্ণবী কর্পোরেট কনসালটেন্ট, নোয়েসিস কনসালটিং, ভিটকম, নিউকম কনসালটিং। ভিটকম 'এনডিটিভি ইমাজিন'–এর ব্যবসা দেখে। নিউকম তৈরি হয়েছে কেবলমাত্র মুকেশ আম্বানি গ্রুপের কোম্পানিগুলির বিষয় দেখাশোনার জন্য। বৈষ্ণবী দেখে টাটা গ্রুপ, ইউনিটেক, স্টার টিভি এবং অন্যান্য কর্পোরেট ক্লায়েন্টের মিডিয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং 'পরিবেশ ম্যানেজমেন্ট'। রাদিয়া নিয়ন্ত্রিত নোয়েসিস অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের নিয়ে তৈরি, পাওয়ার–টেলিকম–বিমানশিল্প–পরিকাঠামো বিষয়ে পরামর্শদাতা। এই সংগঠনগুলি কেবল মিডিয়া ম্যানেজ করে তাই নয়, এরা এদের ক্লায়েন্টদের ব্যবসায়িক স্বার্থে নীতির পরিবর্তন ও সরকারি দপ্তরগুলির সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করে বলে অভিযোগ। এরা কে কোন দপ্তরের মন্ত্রী হবে, সে বিষয়েও নাক গলায়। ট্যাপ করা ফোনালাপগুলি থেকে মনে হয়, সরকারের উচ্চতম স্তরে নীতির পরিবর্তনে নীরা রাদিয়ার ভূমিকা আছে, যার সঙ্গে যুক্ত ইউনিটেক, সোয়ান এবং এয়ারসেল সহ অন্যান্য কর্পোরেটদের টেলিকম লাইসেন্স পাওয়া। ফোনালাপগুলো থেকে আরও মনে হয়, অনেক গোপন নথি ও নীতিগত কাগজ রাদিয়ার কাছে যায়। এছাড়া বৈষ্ণবী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের মাধ্যমে এনট্রি অপারেটরদের অ্যাডজাস্টমেন্ট ও ঘুষ দেওয়ার কাজ করে দেয়। ...

'কথোপকথনগুলি থেকে বোঝা যায়, রাদিয়া টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার খুব ঘনিষ্ঠ এবং সোয়ান, এয়ারসেল, ইউনিটেক ও ডাটাকমকে লাইসেন্স ও স্পেকট্রাম পাইয়ে দেওয়ার হোতা। এর মধ্যে ডাটাকম, যা তৈরি হয়েছে এইচএফসিএল গ্রুপ ও ভিডিওকনের উদ্যোগে, সেখানে পুঁজি আছে মুকেশ আম্বানি গোষ্ঠীর। রিলায়েন্সের (মুকেশ) মনোজ মোদী রাদিয়ার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। সোয়ান, যারা দিল্লি ও মুম্বইয়ে স্পেকট্রাম পাওয়ার ব্যাপারে সরকারি লিস্টে এগিয়ে, তাদের ফান্ডিং করছে মুম্বই ভিত্তিক একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। ...'

এছাড়া ওই অতি গোপন নোটে ট্যাপ করা ফোনালাপ থেকে পাওয়া আরও কিছু তথ্যের উল্লেখ করা হয় : ১) টাটা চাইছে দয়ানিধি মারান যেন টেলিকম মন্ত্রী না হয়। টাটা অপ্রত্যক্ষভাবে এয়ারসেলের ইকুইটি নিয়ন্ত্রণ করে, এয়ারসেলের শেয়ারহোল্ডার ম্যাক্সিস কমিউনিকেশন ও অ্যাপোলো–র মাধ্যমে। মারান মন্ত্রী হলে টাটাকে তা ছেড়ে দিতে হবে। ২) টাটা গ্রুপ তার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ভোল্টাসের মাধ্যমে চেন্নাইয়ে তামিলনাড়ুর শাসক দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক ডিএমকের নেতা করুনানিধি পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে একটি বাড়ি বানাবে। মনে হয় এটা মারানকে না করে রাজাকে মন্ত্রী করার ভেট। উল্লেখ্য, রাজা ও মারান উভয়েই ডিএমকে দলের। ৩) ডিএমকের কেউ, বিশেষত রাজা যাতে টেলিকম মন্ত্রী হয়, তার জন্য কংগ্রেসের কাছে তদ্বির করার জন্য রাদিয়া নিযুক্ত করে সাংবাদিক বরখা দত্ত ও বীর সাংভিকে। ৪) এয়ারটেল (সুনীল মিত্তল) চাইছিল না, রাজা টেলিকম মন্ত্রী হোক। সে চায় মারান মন্ত্রী হোক। সে রিলায়েন্সকে (অনিল) শয়তানের সাম্রাজ্য বলে। মিত্তলের অভিযোগ, রাজা জিএসএম লবির বদলে সিডিএমএ লবিকে বেশি সুবিধা দিয়েছে আগের বারের মন্ত্রীত্বে। মিত্তল রাদিয়াকে তার হয়ে কাজ করতে বলে। রাদিয়া রাজি হয়ে বলে, টাটার হয়ে তার কাজের সঙ্গে সংঘাত না ঘটলে সে মিত্তলের হয়েও কাজ করতে রাজি। সে মিত্তলের সঙ্গে রাজার বন্ধুত্বে ভূমিকা পালন করবে। ৫) টাটা ইউনিটেককে আড়াইশো কোটি টাকা দিয়েছে রাদিয়ার মাধ্যমে। ৬) রাদিয়া বিদেশি বিনিয়োগেও ভূমিকা নিয়েছে। লেম্যান ব্রাদার্স ইউনিটেক রিয়েল এস্টেটে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। তার মধ্যে কিছু টাকা আসার পরই লেম্যান ব্রাদার্স মার্কিন রিয়েল এস্টেট শিল্পে ধস নামলে ডুবে যায়। সেই টাকা ইউনিটেক টেলিকম কোম্পানির ইকুইটি বিক্রি করে ফেরত দেওয়া হবে আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীদের, এমনই ডিল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কথা হয়েছিল প্রথমে ইতালির টেলিকম ইতালিয়া এবং নরওয়ের টেলিনরের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত টেলিনরকেই ইকুইটি বিক্রি করে ইউনিটেক। রাদিয়ার সঙ্গে ইউনিটেকের অজয় চন্দ্রর কথা থেকে বোঝা যায়, একটা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি তদন্ত হলে সরকারকে বোঝাতে হবে যে এতে ইউনিটেকের প্রোমোটারদের খুব একটা লাভ হয়নি, কেবল কিছু বিনিয়োগ এসেছে মাত্র। ৭) নীরা রাদিয়া 'নঈ দুনিয়া' নামের একটি মিডিয়ার ছাজলানিকে বলছে, তাকে কোনো একজনের মুখোশ হিসেবে কাজ করার জন্য। ওই তৃতীয় ব্যক্তি (মুকেশ আম্বানি) নঈ দুনিয়ার মুখোশে 'নিউজ এক্স' চ্যানেলটি পিটার ও ইন্দ্রানী মুখার্জির কাছ থেকে কিনে নিতে চায়। রাদিয়া সাংবাদিকদের নিজের বশে রাখেন গাড়ি, ছুটি কাটানোর টাকা গিফট্ করে। ৮) ঝাড়খণ্ডে একটি খনির লিজের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য টাটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়াকে ১৮০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিল। রাদিয়া সেই লিজ বাড়িয়ে নিতে সফল হয় ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের মাধ্যমে (রাষ্ট্রপতি শাসনে)। এর জন্য টাটা রাদিয়াকে 'সাফল্যের ফি' এবং তার সাথে ১ কোটি টাকা পুরস্কার দেয়। প্রসঙ্গত, সেই সময় ঝাড়খণ্ড ছিল পাঁচ বছরের রাষ্ট্রপতি শাসনে, সিবতে রাজি ছিলেন রাজ্যপাল। দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর গদি যায়। তাঁর দুই আপ্ত সহায়ক আমলার বিরুদ্ধে সিবিআই দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত করছে। ৯) বণিকসভা ফিকি–র প্রধান তরুণ দাস একইসাথে হলদিয়া পেট্রোকেমেরও চেয়ারম্যান। মুকেশ আম্বানি চাইছে হলদিয়া পেট্রোকেম দখলে নিতে এবং এর জন্য রাদিয়ার মাধ্যমে তরুণ দাসকে কাজে লাগাচ্ছে। তরুণ দাস পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল সিপিএমের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছেন। নিরুপম সেন প্রকাশ কারাটের সঙ্গে বৈঠকের বন্দোবস্ত করছেন। মুকেশদের ভয়, পুর্ণেন্দু না বাগড়া দেন, সেক্ষেত্রে সেটা মুকেশকেই সামলাতে হবে। ১০) রিলায়েন্স (মুকেশ)–এর মনোজ মোদী এবং রাদিয়ার একটি কথোপকথন থেকে বোঝা যায়, রাদিয়া দিল্লি ভিত্তিক এক এনজিও–কে দিয়ে রিলায়েন্স (অনিল)–এর বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা করাচ্ছে। এই এনজিও–কে রাদিয়া আগেও কাজে লাগিয়েছিল ডিএলএফ–এর বিরুদ্ধে। এই এনজিও–র মাথায় আছে তিনজন। একজন রাদিয়ার ঘনিষ্ঠ, আরেকজন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সর্দার, এবং তৃতীয় ব্যক্তি খুব নামকরা।

এছাড়াও আরও নানা তথ্য পাওয়া যায় ওই অতি গোপন নোট থেকে।

কিন্তু ...

নয়ের দশকে ভারতে টেলি–ঘনত্ব ছিল একশ' জনে এক জনও নয়, পাড়ার টেলিফোন বুথগুলো ধরে। টেলি–ঘনত্ব বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। ২০০০ সাল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে শুরু করে এই ঘনত্ব। ১৯৯৯ সালের সরকারি নীতিতে ভাবা হয়েছিল, পাড়ার টেলিফোন বুথগুলোরও ভূমিকা থাকবে এই বৃদ্ধিতে। কর্পোরেট আর মানুষ ভেবেছিল একটু অন্যভাবে। আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরল পাড়ার টেলিফোন বুথ। এল হাতে হাতে ফোন। কারোর আবার একটা নয়, দুটো তিনটে ...। ১৯৯৯ থেকে ২০০৩, কখনোই সরকারি নীতি ভাবতে পারেনি, ২০১০ সালে ভারতের টেলি–ঘনত্ব ১৫–২০ শতাংশ ছাড়াবে। কর্পোরেটরাই বা ভাবতে পেরেছিল কি? মোটেই না। কিন্তু কী দাঁড়াল? ভারতে মোট টেলিফোনের সংখ্যা এখন ৮৮.৬ কোটি, আর টেলি–ঘনত্ব ৭৩.৯৭ শতাংশ, ২০১১ সালের ৩০ জুনের হিসেব। হিসেবে যদি ভরসা না–ও থাকে, তবে একটু চারপাশে তাকালেই হয়। হাতে হাতে মোবাইল। মোবাইল ছোটো ব্যবসায়ীদের অপরিহার্য সম্পদ, কমবয়সী পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছেও তার মূল্য অপরিসীম। মোবাইল মেয়েদের সামাজিক বাঁধন থেকে আপাত–মুক্তি। মোবাইল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া মধ্যবিত্তের হাতিয়ার। সর্বোপরি, মোবাইল কমবয়সীদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে গামছা বা জামাকাপড়ের মতো অপরিহার্য একটি জিনিস।

মোবাইলের এই বিস্ফোরক প্রসার শুধু এদেশে হয়নি। আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড হয়ে চীন, সব জায়গায় একই অবস্থা। আর এর জোরেই উড়ে যাচ্ছে নীতি–দুর্নীতির যাবতীয় সওয়াল। বন্দী প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা সিবিআই কোর্টে সওয়াল করছেন শহীদের জোশ নিয়ে, আমি তো প্রতি হাতে মোবাইলের সরকারি স্বপ্নকে সাকার করার চেষ্টা করেছি মাত্র। বর্তমান টেলিকম মন্ত্রী কপিল সিবাল বলছেন, সরকারের রেভিনিউর চেয়ে বড়ো মানুষের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া। বিরোধী নেতা মুরলী মনোহর যোশীর নেতৃত্বাধীন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) ২জি স্পেকট্রাম দুর্নীতি নিয়ে রিপোর্টে কমিটির প্রশ্নের উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, 'উৎপাদকের দৃষ্টিতে স্পেকট্রাম একটা দুর্মূল্য সম্পদ। কিন্তু সেটা দেওয়া মানেই ক্ষতি নয়, যদি বিষয়টিকে গ্রাহক এবং জনস্বার্থের দিক থেকে দেখা হয়। সরকারি নীতি তৈরি হয় সর্বোচ্চ জনস্বার্থের কথা ভেবে, কেবল সরকারের আয়ের কথা ভেবে নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য প্রায়শই নির্ধারণ করা হয় এই লক্ষ্যেই। ... দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও বলা আছে, নীতি নির্ধারণে সরকারের আয় বাড়ানো মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ... তাই কয়েক বছর আগের দামে স্পেকট্রাম দিয়ে দেওয়াকে জাতীয় ক্ষতির চোখে দেখার জবাব হয়ে যায় গ্রাহকের লাভ এবং জনস্বার্থের সাধারণ উন্নয়ন, দ্রুততর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মাধ্যমে' (পিএসি রিপোর্ট, এপ্রিল ২০১১)। নব্য প্রজন্মের কর্পোরেটরা (যাঁদের মধ্যে পড়েন ইনফোসিসের নারায়ণমূর্তি) বলতে পারছেন, ঘুষ দূর করার উপায় ঘুষকে আইনসিদ্ধ করে দেওয়া। দুর্নীতির দায়ে চীনে এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রেওয়াজ থাকলেও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় চীন গত এক দশকে থাকছে বেশ ওপরের দিকে।

সব মিলিয়ে অন্য এক বাস্তবতায় যেতে চাওয়া দুনিয়াতে পুরোনো নিয়ম বা 'নীতি–আদর্শ' কেমন খাপ না খাওয়া, বস্তাপচা জিনিস বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র :

এই লেখায় ব্যবহৃত তথ্যাদি সবই বিভিন্ন প্রকাশ্য সূত্র থেকে নেওয়া। টেলিকম প্রযুক্তি বিষয়টি মূলত 'হাউ থিংস ওয়ার্ক'–এর ওয়েবসাইট থেকে উপলব্ধ। টেলিকম নীতির ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমের ওয়েবসাইটে পাওয়া আইন ও সংযোজনীর বয়ান থেকে। স্পেকট্রাম এবং ইউএএস লাইসেন্স বিলির কালপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে মূলত জাস্টিস শিবরাজ পাতিলের রিপোর্ট থেকে (৩১ জানুয়ারি ২০১১)। কর্পোরেট কার্যকলাপের বিবরণ তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে। নীরা রাদিয়ার টেপের সারাংশ নিয়ে তৈরি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের গোপন নথি পাওয়া গেছে http://indiasreport.com/magazine/data/the-radia-papers-raja-tata-ambani-connection–এই ওয়েবসাইটে। এছাড়া লেখাটি তৈরিতে আরও কিছু নথি ও সূত্র পড়া হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিএজি–র ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি বিষয়ে রিপোর্ট, সাংবাদিক গোপীকৃষ্ণনের ইন্টারনেট ডায়েরি, তহলকা ডট কমের ওয়েবসাইটে পাওয়া পিএসি রিপোর্ট (এপ্রিল ২০১১) এবং আউটলুক, ডেইলি পাইওনিয়ার প্রভৃতি মিডিয়ার ওয়েবসাইট।

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হ'ন।

সারা বছরের ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com

আইনি থেকে বেআইনি খনিজ উত্তোলন
দুর্নীতির অদৃশ্য লম্বা হাত
কর্নাটকের লোকআয়ুক্ত সন্তোষ হেগড়ের রিপোর্টের একটি পর্যালোচনা

জিতেন নন্দী

কর্নাটকের বেআইনি আকরিক লোহা উত্তোলন নিয়ে ওই রাজ্যের লোকআয়ুক্ত সন্তোষ হেগড়ের দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে ২৭ জুলাই। প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮। আকরিক লোহা হল এমন একমাত্র বস্তু (সম্ভবত খনিজ তেল বাদ দিয়ে) যা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে অন্য যে কোনো পণ্যের চেয়ে বেশি জড়িয়ে রয়েছে। কারণ আকরিক লোহা থেকে প্রস্তুত ইস্পাত হল এমন এক ধাতু, বিশ্বে যার ব্যবহার সমস্ত ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৯৫%। অতএব আমরা এমন এক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, যে রিপোর্ট ভারতের একটা রাজ্যের বিষয় বলে আপাতভাবে মনে হলেও তার এক বিশ্ব জোড়া তাৎপর্য রয়েছে।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, শহরের ট্রাফিক পুলিশ থেকে দেশের মন্ত্রী পর্যন্ত মানুষেরা যেসব দুর্নীতির মধ্যে প্রায়শই জড়িয়ে পড়ে, দুর্নীতি কি সেটুকুই? নাকি দুর্নীতির হাত আরও লম্বা? আর সেই হাত আদৌ সবটা দেখা যায় কিনা, সে প্রশ্নও এই রিপোর্ট পড়লে সঙ্গতভাবেই উঠে পড়বে।

কর্নাটক লোকআয়ুক্ত আইন, ১৯৮৪–র ৭(২–এ) ধারা বলে কর্নাটক সরকার ২০০৭ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে চারটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০০০ থেকে ১৯ জুলাই ২০১০ অবধি সময়কালে কর্নাটকের বেলারি, টুমকুর ও চিত্রদুর্গা জেলায় বেআইনি খনিজ উত্তোলন (মূলত আকরিক লোহা) ও আনুষঙ্গিক কয়েকটি ক্ষেত্রের দুর্নীতি নিয়ে কর্নাটকের তৎকালীন লোকআয়ুক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সন্তোষ হেগড়েকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়। আমাদের পর্যালোচনার বিষয় শ্রী হেগড়ের রিপোর্ট।

বেআইনি খনিজ উত্তোলন কথাটা শুনলে মনে হয় খনিজ উত্তোলনের একটা আলাদা আইনি গল্প আছে। যেন আপত্তি কেবল বেআইনি ব্যাপারটুকু নিয়েই। সেখানেও প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটা দুর্নীতি কাকে বলছি সেই অবধি চলে যায়। নৈতিকতা এবং মানবিকতার প্রশ্ন যদি দুর্নীতির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে বলা যেতে পারে, পৃথিবীর বুক থেকে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ইতিহাস, বেবাক দুর্নীতির ইতিহাস। কিন্তু আমরা ভদ্দরলোকেরা মানবিকতার বিষয়টাকে বাদ দিয়ে নৈতিকতার একটা পরিসর ইচ্ছে মতো গড়ে নিয়েছি। সেখান থেকেই তো দুর্নীতির শুরু। আমরা দিব্যি পাথরের মোজাইক করা মেঝের ওপর বসে পাথর খাদানের নির্মমতা নিয়ে আলোচনা করতে পারি; প্রাইভেট মোটরগাড়িতে চেপে এসে খনিশ্রমিকের দুর্দশা নিয়ে বক্তৃতাও করতে পারি। আমাদের নৈতিকতায় তা আটকায় না। সন্তোষ হেগড়ের রিপোর্টেও এই অ–নৈতিকতার সামাজিক গ্রাহ্যতার বিবরণ রয়েছে ছত্রে ছত্রে। কিন্তু এই নৈতিকতার কলুষতাকে বুঝতে আমাদের নতুন করে একটা রিপোর্ট কেন লাগবে? প্রত্যেকদিন আমাদের ব্যক্তিমন চলতে–ফিরতে যে দুর্নীতিতে সায় দেয়, তার সঙ্গেই তো লেপ্টে রয়েছে আমাদের বিবেক, কাণ্ডজ্ঞান। যথেচ্ছভাবে মাটির ভিতর থেকে খনিজ তুলে লোভী মনের খিদে মেটানোর দুর্নীতিকে আমরা সকলেই বিলক্ষণ চিনি।

আইনি খনিজ উত্তোলন

১৯৬০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বেলারি জেলায় আকরিক লোহা উত্তোলন একভাবে চলছিল। হঠাৎ ঝড়ের মতো কোথা থেকে এল 'চায়না বুম'! বেলারি জেলায় বেলারি, হোসপেট ও সান্দুর তালুক নিয়ে যে খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল সেখানে ১০০০ মিলিয়ন টন আকরিক লোহার সঞ্চয় রয়েছে। ২০০০ সাল অবধি বাৎসরিক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উৎপাদন মিলিয়ে এই সঞ্চয়ের ১%–এর কিছু বেশি উত্তোলন হত। ২০০১–০২ সালে উৎপাদন ছিল প্রায় ১২.৪ মিলিয়ন টন; ২০০২–০৩ সালে ছিল ১৩.৯ মিলিয়ন টন। ২০০৪–০৫ সালের চায়না বুমের পর ২০০৭–এর শেষে এই উৎপাদন বেড়ে হল ৪১ মিলিয়ন টন। এই চায়না বুমের ধাক্কায় বেলারি জেলায় প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ হাজার লরি ভর্তি আকরিক লোহা খনিগুলো থেকে রেলস্টেশন আর সমুদ্র বন্দরে যাতায়াত করত। হঠাৎ খনিজ উত্তোলনে এক লাফে এতখানি বৃদ্ধি এই অঞ্চলের সমস্ত আইনি ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিল।

কর্নাটকে দীর্ঘকাল যাবৎ আকরিক লোহার ব্যবসায় কিছু পরিবার যুক্ত ছিল। যেমন, সান্দুরের রাজ পরিবার — যাদের স্থানীয় মানুষ 'রাজা' বলে সম্বোধন করত — তাদের এলাকায় ম্যাঙ্গানিজ ও আকরিক লোহা উত্তোলন করাত। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে যখন মন্দা এল, দেশের ভিতরেও ক্রেতারাই আকরিকের দাম স্থির করত। ফলে এই পুরনো পরিবারগুলোর ব্যবসা ঝিমিয়ে পড়ল। ২০০২ সালে চীনে প্রচুর আকরিক লোহার দরকার পড়ল। ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে ছিল বেজিং অলিম্পিক। আসলে চায়না বুম শুধু অলিম্পিকের ব্যাপার ছিল না। দুই দশক আগে থেকেই চীন হয়ে উঠেছিল পশ্চিমি উন্নত দেশগুলোর উৎপাদন বা ফ্যাকট্রি অঞ্চল। আকরিক লোহার উত্তোলন থেকে শুরু করে ইস্পাত নির্মাণ এবং ইস্পাত ব্যবহার করে গাড়ি শিল্প, সবটাতেই পরিবেশ ভয়াবহ দূষিত হয়। তার প্রতিটি স্তরে জড়িয়ে থাকে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার উষ্ণায়নের সমস্যা। ইউরোপ–আমেরিকার বড়ো কোম্পানিগুলো তাদের ব্র্যান্ড–উৎপাদনের ওয়ার্কশপ এশিয়ার দেশগুলোতে সরিয়ে ফেলতে চাইছিল। এরই ফলশ্রুতিতে এসেছিল চায়না বুম। আর এর জন্যই বেড়েছিল ভারত থেকে আকরিক লোহার রপ্তানি বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান তাগিদ। ২০০৫ সালে চীন ও ভারত সরকারের মধ্যে মাইনিং সেক্টরে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

গোটা শিল্পদুনিয়া জুড়ে ইস্পাতের খিদে যেন রাতারাতি বেড়ে গেল। প্রচুর ইস্পাত তৈরি হবে, প্রচুর আকরিক লোহা দরকার। টার্গেট হল বেলারি–হোসপেট–সান্দুর অঞ্চল। এই অঞ্চলের (সান্দুর

বেল্ট) আকরিক লোহা খুবই উচ্চমানের, আকরিকের মধ্যে ধাতব Fe কন্টেন্ট ৬২–৬৮ শতাংশ। বেলারি জেলায় আকরিক লোহা উত্তোলনের ১৩২টি আইনি অনুমোদন (মাইনিং লিজ) রয়েছে। এর মধ্যে ৯৯টি জঙ্গল এলাকায়, ৩৩টি জঙ্গল নয় এমন সরকারি জমিতে, যার মধ্যে রয়েছে পাট্টা জমি। এছাড়া, বিশাল চাষের জমি এলাকাতেও ভাসমান আকরিক লোহা রয়েছে, যা মাটির ৫ থেকে ১০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। সরকারি, জঙ্গল এবং পাট্টা জমিতেও ভাসমান আকরিক রয়েছে। এই লিজ নিয়ে যারা আকরিক লোহা উত্তোলন করে, তারা এক মেট্রিক টন আকরিক উত্তোলন বাবদ সরকারকে ১৬–২৭ টাকা রয়ালটি দেয়। আকরিকের মান (Fe কন্টেন্ট) অনুযায়ী তা কমবেশি হয়। যখন এই আকরিকের রপ্তানির তেমন চাহিদা ছিল না, তখন এক মেট্রিক টন আকরিকের রপ্তানি-মূল্য ছিল ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। ২০০৪–০৬ পর্যায়ে যখন রপ্তানি তেজী হল, তখন দর ছিল ৬০০০–৭০০০ টাকা। সরকারি হিসেবে, এক মেট্রিক টন আকরিক উত্তোলনের খরচ ১৫০ টাকা। তার সঙ্গে পরিবহন খরচ পড়ে ২৫০ টাকা এবং রয়ালটি যোগ করলে মোট খরচ দাঁড়ায় ৪২৭ টাকা। যদি এক মেট্রিক টনের রপ্তানি-মূল্য সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১৫০০ টাকা হয়, তাহলেও রপ্তানিকারীর এক মেট্রিক টন পিছু ১০৭৩ টাকা লাভ হয়। টন পিছু এত বেশি লাভের হার, অথচ সরকার খুব বেশি হলে পায় মাত্র ২৭ টাকা।

তথাকথিত চায়না বুমের পর্বে ইস্পাতের আন্তর্জাতিক দর খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক লাফে বেড়ে গেল; বেলারি-হোসপেট-সান্দুর অঞ্চল থেকে আকরিক লোহা বিদেশে রপ্তানি করা এক অতি লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠল। সরকারকে বঞ্চিত করে বেসরকারি ও ব্যক্তিগতভাবে সেই বিপুল মুনাফাকে হস্তগত করার জন্য একটা চক্র গড়ে উঠল। এই চক্রের মধ্যে নানা সরকারি বিভাগ ও সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বহু মানুষের মদত যুক্ত হল। ক্রমাগত খনিজ উত্তোলনের আইনি সীমা ছাড়িয়ে বেআইনি পথে খনিজ উত্তোলন এক প্রকাশ্য ও মুখ্য ঘটনা হয়ে উঠল।

১৫ মার্চ ২০০৩ কর্নাটক সরকার (কংগ্রেসের এস এম কৃষ্ণা ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, এখন তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী) সরকারি উদ্যোগে খনিজ উত্তোলনের জন্য সংরক্ষিত ১১৬২০ বর্গ কিমি জমি এবং আকরিক লোহা সমৃদ্ধ আরও ৬৮৩২.৪৮ হেক্টর জমি বেসরকারি খনিজ উত্তোলনের জন্য (ডি-রিজার্ভ) ছেড়ে দিল। এই বিশাল পরিমাণ জমি যেসব ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে গেল, তারও কোনো মানদণ্ড সরকারের কাছে ছিল না। সরকারের তরফে বলা হয়েছিল, খনিজ উত্তোলন ভিত্তিক শিল্পগুলোতে আরও চাকরি সৃষ্টি করা, বেসরকারি পুঁজিকে আকৃষ্ট করা এবং পেশাদার পরিচালকদের হাতে রাজ্যের খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এইভাবে সরকারি জমি বেহাত করা হচ্ছে। এর ওপর সরকারি লিজের নির্ধারিত সীমানা, সময়কাল ছাড়িয়ে অবাধে খনিজ উত্তোলন হতে থাকল। পাট্টা জমি এবং জঙ্গল এলাকাতেও সেই বেআইনি উত্তোলন প্রসারিত হল। এই বেআইনিভাবে তোলা আকরিক লোহা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেআইনি ট্রান্সপোর্ট পারমিট, ফরেস্ট পাস দেওয়া হল। ট্রাকগুলোতে ইচ্ছে মতো ওভারলোড করে আকরিক পরিবহণ চলতে থাকল।

২০০৩–০৪ এবং ২০০৪–০৫ সালের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের তদন্ত রিপোর্টে ধরা পড়ল, মাইসোর মিনারেলস লিমিটেড নামক পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং সংস্থার বেআইনি কার্যকলাপ। বেশ কিছু চুক্তি, কন্ট্রাক্ট, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদি করা হয়েছে এমন কিছু বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিদের সঙ্গে, যাতে একতরফাভাবে সরকারের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত পরিমাণের অনেক বেশি পরিমাণে আকরিক লোহাচূর্ণ, মাড স্টক/নিম্নমানের আকরিক বাজার দরের থেকে অনেক কম দামে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই হল আইনি ব্যবস্থার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বেআইনি কার্যকলাপের এক বিশাল এবং সুসংগঠিত ব্যবস্থা। কর্নাটকের লোকআয়ুক্ত রিপোর্ট জুড়ে রয়েছে তারই বিবরণ। দু-একটি উদাহরণ দিলে এই ব্যবস্থার স্বরূপ কিছুটা বোঝা যেতে পারে।

ওবুলাপুরম মাইনিং কোম্পানি

ওবুলাপুরম হল বেলারির মধ্যে আকরিক লোহার এক অতি সমৃদ্ধ খনি এলাকা। এক বিশেষ পরিবার এই আকরিক উত্তোলনে আকৃষ্ট হয়। ওবুলাপুরম মাইনিং কোম্পানি তৈরি করে তারা এইসময় খনিজ উত্তোলনের লিজ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। কর্নাটকে লিজ না পেয়ে তারা লাগোয়া অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলায় ১৩৪ হেক্টর খনি এলাকায় লিজ আদায় করে। এই লিজ এলাকায় আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন টন আকরিক লোহার সঞ্চয় রয়েছে। প্রথম থেকেই অন্ধ্রের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। আইনত তারা অন্ধ্রের ওই এলাকায় আকরিক লোহা তুলতে শুরু করে। কিন্তু রপ্তানি ব্যবসার প্রবল চাহিদা মেটাতে তারা বেআইনিভাবে কর্নাটকের সীমানার মধ্যে ব্যাপকভাবে আকরিক উত্তোলন করতে থাকে। ইতিমধ্যে বিদেশেও তাদের ভালো যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এই কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন জি জনার্দন রেড্ডি, জি লক্ষ্মি অরুণা, জি করুণাকর রেড্ডি, ডি পরমেশ্বর রেড্ডি এবং বি শ্রীরামুলু।

২০০৪ সালে সিঙ্গাপুরে ম্যান-গো পাব পিটিই লিমিটেড নামে এক বেসরকারি কোম্পানি নথিভুক্ত হয়। তারা খাদ্য, পানীয় ও আমোদপ্রমোদের পরিষেবা দিত। ২০০৭ সালে এই কোম্পানির নাম বদল করে রাখা হয় জিএলএ ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল পেট লিমিটেড এবং তার কাজের বদল হয়ে যায়। এখন এটি আমদানি-রপ্তানি সহ হোলসেল ট্রেডিং কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্ত হয়। ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ জি জনার্দন রেড্ডি এই কোম্পানির ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই কোম্পানির একটা শেয়ার আইল অফ ম্যান-এর জিজেআর হোল্ডিংস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের নামে স্থানান্তরিত করা হয়। আইল অফ ম্যান হল একটি ট্যাক্স হেভেন অর্থাৎ করমুক্ত অঞ্চল। ২০০৯ সালে ওই শেয়ারটি ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের ইন্টারলিঙ্ক সার্ভিসেস গ্রুপ লিমিটেডের নামে স্থানান্তরিত হয়। ব্রিটিশ ভার্জিনও ট্যাক্স হেভেন নামে পরিচিত। জনার্দন রেড্ডি ডিরেক্টর থাকাকালীন বেলারির ওবুলাপুরম কোম্পানি থেকে জিএলএ পেট লিমিটেডে কর্নাটক অরিজিনের ৮,৫২,০৩৩ মেট্রিক টন আকরিক লোহা রপ্তানি করা হয়। চালানে কারচুপি করে (আন্ডার-ইনভয়েসিং) ২০০৭–০৮ এবং ২০০৮–০৯ এই দু'বছরে ওবুলাপুরম কোম্পানি রপ্তানি বাবদ প্রায় ২১৫ কোটি টাকার বেশি সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেয়। ওবুলাপুরম কোম্পানির কর্নাটকে কোনো লিজ বা অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও কর্নাটক উৎসের ৭১,৬১,৪৫৫ মেট্রিক টন আকরিক লোহা তারা

রপ্তানি করে ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে। এছাড়া ওইসময় অন্ধ্র উৎসের আকরিক লোহাও তারা রপ্তানি করেছে। কিন্তু কর্নাটকের আকরিক রপ্তানির পুরোটাই ছিল বেআইনি।

২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে মোট ১২.৫৭ কোটি মেট্রিক টন কর্নাটক উৎসের আকরিক লোহা রপ্তানি হয়েছিল কর্নাটক, তামিল নাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়ার দশটি বন্দর থেকে। লোকআয়ুক্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী এর মধ্যে ২,৯৮,৬০,৬৪৭ মেট্রিক টন ছিল বেআইনিভাবে রপ্তানি হওয়া আকরিক। প্রথম লোকআয়ুক্ত রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পর কর্নাটক সরকার ২৮ জুলাই ২০১০ রপ্তানির ওপর পারমিট দেওয়া নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এর পরেও বিভিন্ন বন্দর থেকে ৮৩টি রপ্তানি করা হয়। তার পরিমাণ ছিল ১৭,৫৮,৩৩৬ মেট্রিক টন।

২০০৫–০৬ নাগাদ রপ্তানিকারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে রেষারেষি বেড়ে যায়। সকলেই রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যবহার করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ওবুলাপুরম পরিবার এইসময় রাজনীতিতে আসে এবং বিজেপিতে যুক্ত হয়। তারা নির্বাচনে সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে সুষমা স্বরাজের পক্ষ নেয়। কর্নাটকের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর (জনতা দল, সেকুলার) সঙ্গে রেড্ডি ভাইদের বিরোধ শুরু হয়। তারা কুমারস্বামীর নামে সরকারি সুযোগ কাজে লাগিয়ে ১৫০ কোটি টাকা হস্তগত করার অভিযোগ তোলে। সরকারি তদন্ত কমিশন বসে। তদন্ত মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জনার্দন রেড্ডি হাইকোর্টে মামলা করেন। এইসময় সন্তোষ হেগড়েকে লোকআয়ুক্ত নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। জি করুণাকার রেড্ডি, জি জনার্দন রেড্ডি এবং জি সোমশেখর রেড্ডি ২০০৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে নতুন বিজেপি সরকারের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। কিন্তু সমস্যা শুধু রেড্ডি ভাইদের নিয়েই ছিল না। আইনি লিজ এলাকার বাইরে ১০০–১৫০ জায়গায় আকরিক লোহার উত্তোলন চলছিল। ওবুলাপুরম একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত মাত্র।

জিন্দাল স্টিল

১৯৮২ সালে জিন্দাল গ্রুপ তাদের প্রথম স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করে মুম্বাইয়ের কাছে ভাসিন্দ-এ। এরপর তারা পিরামল স্টিল্‌স লিমিটেড নামে একটা কোম্পানি কিনে নেয়। মহারাষ্ট্রের তারাপুরে পিরামলের একটা ছোটো স্টিল প্ল্যান্ট ছিল। জিন্দালের নতুন নামকরণ হয় জিন্দাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড (JISCO)। ১৯৯৪ সালে তারা বেলারি-হোসপেট অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মানের আকরিক লোহা সমৃদ্ধ এলাকা তোরানাগাল্লু-তে ৩৭০০ একর জমিতে জিন্দাল বিজয়নগর স্টিল লিমিটেড (JVSL) নির্মাণ করে। ২০০৫ সালে JISCO এবং JVSL মিলে তৈরি হয় JSW। JSW ঘোষণা করেছে, পশ্চিমবঙ্গ (শালবনী) ও ঝাড়খণ্ডে ১০ মিলিয়ন টন বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতার দুটি গ্রিনফিল্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করে ২০২০ সালে তারা বছরে ৩৪ মিলিয়ন টন ইস্পাত তৈরি করবে।

১২ এপ্রিল ২০১১ JSW কর্নাটক সরকারকে জানিয়েছে, কর্নাটক মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর স্টিল প্ল্যান্টের জন্য তাদের বছরে মোট ২৭১.৫ লক্ষ টন আকরিক লোহা দরকার। কিন্তু লোকআয়ুক্ত দপ্তরে পাঠানো JSW-র পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০০৯–১০ সালে ইস্পাত উৎপাদনে তাদের আকরিক লোহা ব্যবহার হয়েছে অনেক কম, ৯৬ লক্ষ টন।

আকরিক লোহা উত্তোলনের লিজ রয়েছে এবং ট্রেডার মিলিয়ে ৬০টি কোম্পানি JSW-কে সড়ক ও রেলপথে আকরিক সরবরাহ করে। ২০০৯-এর এপ্রিল থেকে ২০১০-এর জুলাই পর্যন্ত ট্রাক পিছু হিসেব অনুযায়ী সরকারি পারমিটের বরাদ্দ থেকে কমপক্ষে ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭০৭ টন বাড়তি পরিমাণ আকরিক JSW-কে সরবরাহ করা হয়েছে (পারমিট অনুযায়ী এক-একটা লরিতে ১৬ টন আকরিক বওয়ার অনুমোদন রয়েছে, বাড়তি লোড করে JSW-কে ৬৫,৩৩,৮৭২ টনের জায়গায় ৭৮,২৬,২৭৬ টন আকরিক সরবরাহ করা হয়।) সেইসময় এক টন আকরিকের বাজার দর ছিল ২৫০০ টাকা। সেই হিসেবে সরকারের ৩২৪,৪২,৭২,৫০০ টাকা অর্থাৎ ৩২৪ কোটি টাকার কিছু বেশি ক্ষতি করানো হয়েছে। এর জন্য দায়ী করা হয়েছে ট্রান্সপোর্টারদের। কিন্তু ট্রান্সপোর্টারদের পিছনে কোন অদৃশ্য হাত রয়েছে?

১৭ জানুয়ারি ১৯৯৭ মাইসোর মিনারেল্‌স লিমিটেড (MML) জিন্দালদের JVSL-এর সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি 'বিজয়নগর মিনারেল্‌স প্রাইভেট লিমিটেড' (VMPL) গঠন করে জিন্দাল স্টিল প্ল্যান্টে দরকার মতো আকরিক লোহা সরবরাহ করতে সম্মত হয় রাষ্ট্রায়ত্ত MML। এই ব্যাপারে থিম্মাপ্পানাগুড়ি মাইন VMPL-এর হাতে দেওয়া হয়। সেইসময় থেকে ২০০৪-০৫ সাল পর্যন্ত চালানের (ইনভয়েস) কারচুপি (যতটা খাতায় কলমে দেখানো হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি আকরিক লোহা সরবরাহ করা হয়েছে।) করে MML-এর ২৫ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি করানো হয়। এর জন্য লোকআয়ুক্ত রিপোর্টে সেইসময়কার ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের দায়ী করা হয়। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, জিন্দাল ছাড়াও কল্যাণী স্টিল, কল্যাণী ফেরাস, মুকুন্দ-এর সঙ্গে চুক্তি বাবদ বেআইনি সুবিধা দিয়ে MML-এর প্রচুর টাকা ক্ষতি করানো হয়েছে। এব্যাপারে MML পরিচালকদের কাছে কিছু ব্যক্তি ও সংস্থাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য সুপারিশও করেছেন বিভিন্ন মন্ত্রী এবং বিধায়কেরা। লোকআয়ুক্ত রিপোর্টে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে যে এইসব সুপারিশ বেআইনি। কিন্তু যারা সুবিধা পেয়েছে, কখনই তাদের দিকে আঙুল ওঠেনি। লোকআয়ুক্ত আইনের সেই এক্তিয়ার নেই।

সরকারি MML কোম্পানির হাতে হাজার হাজার কিমি আয়তনের খুব ভালো মানের খনি রয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, আকরিক লোহার চাহিদা যখন তুঙ্গে, তখনও MML-এর খনিজ উত্তোলনে কোনো উদ্যোগ নেই। এই পর্বে তারা কেবল সরকারি হেফাজতে থাকা খনিগুলোর সাব-লিজ বন্টন করে গেছে থার্ড পার্টিদের। ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে এই কোম্পানির ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে জিন্দালদের মতো বেসরকারি কোম্পানিগুলোর কাছে এইভাবে বেআইনি কোটি কোটি টাকা এবং আকরিক লোহা তুলে দেওয়া হয়েছে কেন? শুধু শিল্পায়নের যুক্তি কি এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা যায়? সন্তোষ হেগড়ের রিপোর্টে MML-এর একের পর এক ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু

পরপর প্রত্যেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যক্তিগতভাবে এইভাবে দুর্নীতির খপ্পরে পড়ল কীভাবে? এখানেই কি রয়েছে দুর্নীতির সেই অদৃশ্য হাতের নিয়ন্ত্রণ?

রিপোর্টে দায়ী করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পাকে। মিডিয়াও ইয়েদুরাপ্পার ওপর এতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে যে এই বিশাল এবং সুসংগঠিত কাণ্ডের অন্য যোগাযোগগুলো জনমনে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। JSW তার সাপ্লায়ারদের মাধ্যমে ইয়েদুরাপ্পার পরিবার চালিত 'প্রেরণা এডুকেশন সোসাইটি' নামক এনজিও–কে ১০ কোটি টাকা দান করেছে। সাউথ ওয়েস্ট মাইনিং নামে JSW–র এক সহযোগী কোম্পানি ইয়েদুরাপ্পার দুই ছেলে ও নাতির কাছ থেকে ২০ কোটি টাকায় বাঙ্গালোরে এক একর জমি কিনেছে। অথচ সেই জমির বাজার দর ছিল কমবেশি এক কোটি টাকা। কিন্তু সন্তোষ হেগড়ের পুরো রিপোর্ট পড়লে এইসব দুর্নীতির ঘটনাকে নেহাত তুচ্ছ বলেই মনে হয়।

JSW স্টিল লিমিটেড ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা) সম্পত্তির মালিক ও পি জিন্দাল গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। মাত্র এক দশকের মধ্যে একলাফে তার বিশাল বৃদ্ধি ঘটে। স্টিল, এনার্জি, বন্দর ও পরিকাঠামো, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম এবং তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের দুনিয়ায় তার প্রবেশ ঘটে। চিলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মোজাম্বিকে এই গ্রুপ আকরিক লোহা সহ খনিজ সম্পদের দখল নিয়েছে। এবছর বলিভিয়া থেকেও জিন্দালরা আকরিক লোহা রপ্তানি শুরু করেছে। বোঝা যায়, ইস্পাত এবং তার কাঁচামাল আকরিক লোহা দুটোর ব্যবসাই জিন্দালদের হস্তগত।

জিন্দালদের এই আগ্রাসী দখলদারীর মেজাজ শেয়ারবাজারে যথেষ্ট কদর পায়। মিডিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের এই আত্মবিশ্বাস জনমনে ছড়িয়ে দেয়। অতীতে আমরা দেখেছি, বাজার দখল হয়েছে কখনও বিশেষজ্ঞতার জোরে, কখনও ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে, কখনও উৎপাদন খরচ কমিয়ে। কিন্তু এখন এই বিশ্ব–কারবারিদের সমস্ত কেনাবেচার ওপরে থাকে 'স্টক' কিনে ফেলার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার জোরে এরা ইস্পাত, শক্তির মতো বড়ো বড়ো বাজারগুলোকে দখল করে। বাজারের দিক থেকে ধেয়ে এসে এরা কাঁচামালের উৎসগুলোকে কব্জা করে নেয়। কিন্তু মোটেই পুরনো কায়দায় নয়। খনিতে এদের হয়তো সরাসরি তেমন দখল নেই। তার দাবিদারও এরা নয়। যদিও শোনা যাচ্ছে, ওবুলাপুরমের কিছু শেয়ার নাকি JSW কিনতে চাইছে। কিন্তু জিন্দালরা সেই সাবেকি খনিমালিক মোটেই নয়। খনি ও খনিজের ওপর এদের কায়েম হয়েছে এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ। 'দৃশ্য' ঘটনাগুলো উঠে আসছে আদালতের কাঠগড়ায়, অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের রিপোর্টে, পরিবেশগত পরিসংখ্যানে, সন্তোষ হেগড়ের বিস্তৃত বিবরণে। শত শত সরকারি অফিসার, ১১ জন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচালক (সিএমডি), মন্ত্রী–মুখ্যমন্ত্রী ফেঁসে যাচ্ছে; তাদের সাজা ও আর্থিক জরিমানার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে রিপোর্টে। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, 'হোসপেট–সান্দুর–বেলারি অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো হিসেব–বহির্ভূত নথিভুক্ত এবং অনথিভুক্ত আকরিক লোহার কারবারি গজিয়ে উঠেছে। গত দু–তিন বছরে, এই বেআইনি ব্যবসায় বড়ো অংকের মুনাফা থাকার কারণে, এক মাফিয়া ধরনের কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। এর সম্পূর্ণ মদত করছে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে পুলিশ বিভাগ, আরটিও, মাইন্‌স, ফরেস্ট, রাজস্ব, কমার্সিয়াল ট্যাক্স, রাজ্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, লেবার, ওয়েট অ্যান্ড মেজার্স এবং অন্য দপ্তরের আধিকারিকেরা।' এদের ঘুষের পরিমাণ, কে কত টাকা সরকারের ক্ষতি করেছে ইত্যাদি সমস্ত হিসেব এই রিপোর্টে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ঘুষ যারা দিচ্ছে, যারা বিদেশি ব্যাঙ্কে অর্থ জমা করে দিচ্ছে, যাদের হাতে রয়েছে পাওয়ারফুল অব্যর্থ রিমোট কন্ট্রোল, তাদের তেমনভাবে ধরা যাচ্ছে না। সন্তোষ হেগড়ের রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পরদিন জিন্দালদের শেয়ারের দর ৫% পড়ে গেছে। আদানি, এনএমডিসি–র (এনএমডিসি ন্যাশনাল মিনারেল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন, কর্পোরেট, যাতে ভারত সরকারের প্রচুর শেয়ার রয়েছে) শেয়ারের দরও পড়ে গেছে। এদের নাম রয়েছে সন্তোষ হেগড়ের রিপোর্টে। তার প্রতিক্রিয়ায় শেয়ারবাজারের আত্মবিশ্বাসে সামান্য চিড় ধরেছে। জিন্দালদের কাছে সেটুকুই যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ।

দুর্নীতি এক নতুন ক্ষমতা

জিন্দালদের ব্যবসার গতিবিধি এখানে একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। দুর্নীতির এক নতুন ক্ষমতার আন্দাজ পেতে এই দৃষ্টান্ত ধরে আমরা আলোচনা করেছি। জিন্দাল, আর্সেলরমিত্তাল, টাটা স্টিলকে আমরা ভারতীয় কোম্পানি বলেই মনে করি। কিন্তু এদের ব্যবসা মোটেই ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। ২০১০ সালে সারা বিশ্বের ১৪১৩.৫ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন =দশ লক্ষ) মেট্রিক টন ক্রুড স্টিল উৎপাদনের মধ্যে চীনের মোট উৎপাদন ছিল ৬২৬.৭ মিলিয়ন টন (প্রথম স্থানে), ভারতের উৎপাদন ছিল ৬৮.৩ মিলিয়ন টন (চতুর্থ স্থানে)। একই সময়ে আর্সেলরমিত্তালের একার উৎপাদন ছিল ৯৮.২ মিলিয়ন টন, টাটা স্টিলের ছিল ২৩.২ মিলিয়ন টন এবং JSW–র ছিল ৬.৪ মিলিয়ন টন। বিশ্বে বেসরকারি উৎপাদকদের মধ্যে আর্সেলরমিত্তালের স্থান প্রথম, টাটার সপ্তম এবং জিন্দালের ৩৩তম। জিন্দালরা ক্রমশ আরও সামনের সারিতে এগিয়ে আসছে। পরিসংখ্যানগুলো মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, বেসরকারি উৎপাদকদের উৎপাদন কোনো নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়া, ২০১০ সালে JSW কানাডার সিআইসি কর্প অধিগ্রহণ করে নেয়। এইভাবে এশিয়ার নতুন বহুজাতিক ইস্পাত কোম্পানিগুলো ইউরোপের পুরনো নামজাদা ইস্পাত কোম্পানিগুলোকে কিনে নিচ্ছে বা পরস্পর সংযুক্ত হচ্ছে, এই প্রবণতাও এই পর্বে লক্ষ্য করা গেছে।

গ্লোবাল কর্পোরেটদের কোনো বিশেষ পণ্যের (যেমন, ইস্পাত বা আকরিক লোহা) কেনাবেচা কোনো বিশেষ দেশ, কোনো বিশেষ রাজ্য বা অঞ্চল, কোনো বিশেষ প্ল্যান্ট বা সংস্থার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। তাদের সবচেয়ে বড়ো পুঁজি তামাম বিশ্ববাজারের ওপর কায়েম হয়ে থাকা তাদের অদৃশ্য ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে কোনো দেশের সরকার, সরকারের মন্ত্রী–আমলারা, খনিজ বা প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ দখলদারী কায়েম করে থাকা ওবুলাপুরমের মতো স্থানীয় বহু কোম্পানি। মিডিয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় 'শিল্পায়ন', 'উন্নয়ন' ইত্যাদি বুলির আড়ালে এই নিয়ন্ত্রণকে পুষ্ট করে।[১] এই নতুন ক্ষমতা নিজেই এক দুর্নীতি। কারণ প্রচলিত সমস্ত নীতি, আইন, সংবিধান, গণতন্ত্র এবং মানবিকতার উর্দ্ধে এই ক্ষমতার বিচরণ।

সূত্র :

১. **Report of Karnataka Lokayukta, Part I, 18 December 2008**
২. **Report of Karnataka Lokayukta, Part II, 27 July 2011**
৩. **World Steel in Figures 2011, World Steel Association**
৪. **Mining Lease Is Used As James Bond's Gun, Tehelka Magazine, Vol 7, Issue 13, Dated April 03, 2010**
৫. **JSW Group, Obulapuram Mining Company etc. in Wikipedia**

১ পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাও একইরকম। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন হল, একটা সরকারের পতন হল। এত কিছুর পরেও সরকারের সঙ্গে টাটা গোষ্ঠীর যে চুক্তি হয়েছিল, তার কিছু অংশ আজও জনসমক্ষে আসেনি। সেই চুক্তিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট সিপিআইএম নেতারা যথেষ্ট হেনস্থা হয়েছিলেন। কিন্তু কখনই মিডিয়াতে টাটার সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। আমার কাছে কলকাতার এক নেতৃস্থানীয় সিপিআইএম কর্মী একান্তে বলেছিলেন, 'দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপর তৃণমূল এবং মমতা ব্যানার্জি যে অবস্থান করে বসেছিলেন, তা পুলিশ দিয়ে তুলে দেওয়া উচিত ছিল। সেইসময় মুখ্যমন্ত্রী ও দায়িত্বশীল নেতারা দৃঢ় মনোভাব দেখাতে পারেননি। টাটার মতো একটা কোম্পানি রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ায় জনমনে দলের ভাবমূর্তি খারাপ হয়েছে।' দলের নেতাদের সততা নিয়ে যদিওবা প্রশ্ন তোলা যায়, টাটার সততা প্রশ্নের উর্দ্ধে। কারণ সমস্ত সরকারের আমলেই 'উন্নয়ন' বা 'শিল্পায়ন'–এর মতো টাটা বা জিন্দালরা অপরিহার্য।

তিব্বতীদের চোখে চীন [২]

তমাল ভৌমিক

গত সংখ্যায় লেখা শেষ হয়েছিল ৭৯ বছরের বৃদ্ধা পেমোর কাহিনী দিয়ে। এবারের শুরু আরেকজন তিব্বতী মহিলা তেনজিন সেরিং–এর কথায়। ১৯৯৯ সালে 'লাইভ্‌স ইন এক্সাইল'–এর লেখিকা হানি যখন তেনজিন সেরিং–এর সাক্ষাৎকার নেন, তখন তাঁর বয়স ৬৮। এই মহিলার জন্ম তিব্বতের পূর্বদিকে আমদো অঞ্চলে এক কৃষক পরিবারে। ১৯৫৯ সালে চীন তিব্বত আক্রমণ করলে তিনিও পেমোর মতো ভারতে পালিয়ে আসেন। স্বভাবত পেমোর সঙ্গে এঁর জীবনকাহিনীর অনেক মিল। অমিলের দিকগুলো আমরা তেনজিন সেরিং–এর মুখেই শুনব। সবচেয়ে বড়ো অমিল, অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পেমো আর তিব্বতে যেতে পারেননি, তেনজিন গিয়েছিলেন। কিন্তু থাকতে পারেননি, ধরমশালায় ফিরে এসেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে দুটো কথা সেরে নেওয়া দরকার। দুটোই এই লেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। প্রথম কথা, তিব্বতী উদ্বাস্তুদের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখলাম মা–মাসিদের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের মা–মাসিরা পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে এসেছিল দেশভাগের সময়ে। ওদের দুঃখ–কষ্ট, দেশের প্রতি টান, সেখানে ফিরতে না পারার অসহায়তা — এইসবের সঙ্গে তিব্বতীদের অনেক মিল। আর উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনা কাছে–দূরে সদাই চলছে। কখনও তা জাতীয়তাবাদের ঠেলায় কাশ্মীরে বা মণিপুরে, কখনও উন্নয়নের ছকে উড়িষ্যার জগৎসিংহপুরে, কখনও বা আমাদেরই পাড়ায় পাশের বাড়িতে প্রোমোটারের উৎপাতে। তাই এই লেখা দরকারি।

দ্বিতীয়ত, চীন প্রসঙ্গে সেখানকার কমিউন, মাওবাদ ইত্যাদি বিষয়ে নানা লেখা মন্থন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তখনই কথা উঠেছিল যে মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ইত্যাদি জায়গায় চীনের সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বাগুলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীন' বা চীনা কমিউনিস্টদের কী চোখে দেখছে সেটাও আমাদের আলোচনার পরিসরে আসা উচিত। — তমাল ভৌমিক

ফেরা : এক দ্বিতীয় নির্বাসন, আবার নির্বাসনে ফিরে আসা

আমরা বড়োলোক ছিলাম না, গরিবও নয়। এক মাঝারি কৃষক পরিবারে আমার জন্ম। আমাদের পরিবার ছিল বেশ বড়ো। স্বাধীন দেশে মুক্ত পরিবেশে আমার ছেলেবেলাটা সুখেই কেটেছে। চীনা কম্যুনিস্টরা যখন দেশ দখল করে, তখন আমার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। বাবা চেয়েছিলেন ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করে সবার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে এবং সেটা তিনি পেরেওছিলেন। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পরপরই চারিদিকে সব দ্রুত বদলে যেতে লাগল — শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, গোটা আমদো অঞ্চলে। খামপার প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে কম্যুনিস্টরা দ্রুত এগোতে লাগল। জীবন হয়ে উঠল বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত। অন্যদের মতো আমার স্বামীও ভাবছিল লাসায় চলে গেলেই বিপদমুক্ত হওয়া যাবে। কারণ সেখানে দলাই লামা ও তিব্বতী সেনারা আছে। প্রথমে আমি আত্মীয়দের ছেড়ে যেতে রাজি হইনি। পরে গিয়ে দেখলাম সেখানে নানা জায়গা থেকে লাখে লাখে তিব্বতী জড়ো হয়েছে। সেই আমাদের প্রথম উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতা। আমরা শহরের গায়ে শিবির খাটিয়ে বসলাম। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা আর বিভ্রান্তি। আমরা সবাই খুব ভয়ে আবার খানিক আশায় বুক বেঁধে প্রতিদিন নতুন খবরের জন্য অপেক্ষা করতাম। ১৯৫৯–এর মার্চে চীনারা দলাই লামাকে ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করল। আমরা ভয় পেলাম, ওরা দলাই লামাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। প্রায় ত্রিশ হাজার তিব্বতী নরবুলিনকার বিভিন্ন গেটে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। তারা আওয়াজ তুলল, চীনাবাহিনী ফিরে যাও! আমার স্বামী এবং আমি সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। লাসায় এমন কেউ ছিল না যে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। আমি নারী প্রতিরোধ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলাম। ... কিন্তু নরবুলিনকায় কামানের গোলা এসে আছড়ে পড়তেই সবাই ছত্রভঙ্গ ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এর মধ্যে দলাই লামার দেশত্যাগের খবর এল। অতিকষ্টে আমরা পালাতে পারলাম। আমাদের অনেক বন্ধু সেই প্রতিরোধ আন্দোলনে মারা গিয়েছিল। তিনদিনের মধ্যেই লাসা এক পরাভূত বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হল। আমরা দেখলাম আমাদের আর কিছু করার নেই। পালানোই বাঁচার একমাত্র রাস্তা। আমি চিরকালই ধর্মভীরু। সারা রাস্তা প্রার্থনা করতে করতে আর মন্ত্র যা জানতাম তাই উচ্চারণ করতে করতে এগিয়েছি। আমার স্বামীও প্রার্থনা করতেন। পথে একজন বৌদ্ধ লামা ও আরও কিছু লোককে সঙ্গী পেলাম। সেই লামা আমাদের মনে সাহস জোগাতেন, বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়ে কঠিন বাস্তবকে মেনে নিতে শিখিয়েছিলেন।

কয়েক সপ্তাহ হাঁটার পরে আমরা বক্সারে পৌঁছাই। সেখান থেকে চলে যাই দক্ষিণ ভারতে। অন্যান্য তিব্বতীদের মতোই আমরা নির্মাণ–শ্রমিক হিসেবে রাস্তাঘাট তৈরির কাজে যোগ দিই। প্রথমদিকের কয়েকটা বছর এমন তাড়াহুড়োয় কাটল যে পিছনে যা কিছু ফেলে রেখে এসেছি তা নিয়ে ভাবার কোনো অবকাশই পেলাম না। স্বপ্নে আমি প্রায়ই তিব্বতকে দেখতে পেতাম। কিন্তু প্রতিদিনকার বাঁচার চেষ্টা, অন্নসংস্থানের উপায় আর উদ্বাস্তু শিবিরের অসুস্থদের সেবায় একটুও ফুরসত পেতাম না অতীত নিয়ে কিছু ভাবার। ...

ভারতে এসে কিছুটা থিতু হওয়ার পরে আমাদের একটা মেয়ে হয়েছিল। আমাদের তখন এমন দুর্দশা যে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলাম না। শৈশবেই সে চলে গেল। আমাদের মেনে নিতে হয়েছিল। পরে অবশ্য আমরা একটা অনাথ মেয়েকে পোষ্য নিই। তাকে বিয়েও দিয়েছিলাম। এখন সে আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। সে আরেক দুঃখের কাহিনী। ...

১৯৮৩ সালে আমার স্বামীর সঙ্গে আমি তিব্বতে গিয়েছিলাম। আমাদের আত্মীয়স্বজন ভাইবোনদের সঙ্গে আমরা দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিব্বতে গিয়ে আমার স্বামী অসুখে পড়ল এবং বেশ কিছুদিন ভুগে মারা গেল। আমার বড়ো বোন বলল, 'তুই আর ধরমশালায় গিয়ে কী করবি?' তার চেয়ে বরং ওর পরিবারের সঙ্গে তিব্বতে থেকে যাওয়াই ভালো। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৫ — এই বারো বছর আমি ওদের সঙ্গেই থাকলাম। কিন্তু কোনোভাবেই আমি ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে মেলাতে পারছিলাম না। ওখানকার জীবনধারা ভারতবর্ষে আমার জীবনধারা থেকে আলাদা। ১৯৯৫ সালে ভারত থেকে কয়েকজন তিব্বতী ভ্রমণার্থী ওখানে যায়। তাদেরকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে আমি চীনা সরকারের কাছ থেকে তিনমাসের জন্য ভারতে আসার অনুমতি পাই। তখন আমি চলে আসি। তারপর থেকে আমি এখানেই আছি। একটা ভাড়াবাড়িতে এখানে থাকি। আমি একমাত্র মুক্ত তিব্বতেই ফিরে যেতে পারি। আর আমার জীবদ্দশায় তা যদি না ঘটে, তাহলে আমি এখানেই থাকব। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাব যাতে তাঁর শান্তির অভিযান অটুট থাকে।

অন্য তিব্বত : তেনজিন সেরিং-এর ভাষ্য

না, ওখানে আমাকে কেউ উত্ত্যক্ত করেনি। একদমই নয়। ওপর থেকে দেখলে, যে এলাকায় আমাদের বাড়ি সেখানকার অবস্থা বেশ স্থিতিশীল বলেই মনে হয়। বর্তমানে আমদো আমাদের দেশের সবচেয়ে উন্নত অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটা। উন্নয়নের চিহ্ন হিসেবে সেখানে গড়ে উঠেছে অনেক বড়ো বড়ো বাড়ি, কারখানা, শিল্পাঞ্চল ও উন্নত কারিগরির নানা ব্যবস্থা। কিন্তু আমার চোখে সেটাকে তিব্বতের কোনো জায়গা বলে মনে হচ্ছে না। ১৯৫৯ সালে যখন পালিয়ে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়ালে আমরা দেখতে পেতাম পাহাড়ের সারি, গাছপালা আর দীর্ঘ পশুচারণভূমি। যখন আমি শিশু বা তরুণী ছিলাম, তখন উঠোনের একটা প্রিয় কোণ ছিল আমার। সেখানে এবার যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন চোখে পড়ল শুধু উঁচু উঁচু প্রবল প্রতাপান্বিত সব বহুতল বাড়ি। না, আমি মনে করি না যে শুধু পুরনোর প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েই আমি ওইসব পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছিলাম না। পুরনোর প্রতি মোহই শুধু নয়, তার চেয়ে আরও বেশি কিছু আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। ... তিব্বতী মানুষদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছিল, আমি দেখছিলাম, তাদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কী একটা জিনিস যেন নেই। আমার মনে হচ্ছিল ওদের যেন বুক ভরা ভয়। চীনাদের কাছে ওরা এমন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল, ওরা কখনও চীনাদের সামনে কথা বলত না। মনে হয় ওরা ধরে নিয়েছিল যে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় নীরবতা পালন করা।

জানেন, বেশিরভাগ অফিসারেরাই চীনা আর তিব্বতীরা তাদের অধস্তন কর্মী। ওরা কম্যুনিস্টদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যে কর্তৃপক্ষ আপনার জীবনের সমস্ত অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা সহজ নয়। তিব্বতীরা সহজে এসব কথা স্বীকার করবে না। কিন্তু আপনি ওদের দেখলেই বুঝতে পারবেন, ওরা কেমন ভয়ে ভয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখলে সবই ভালো, সকলেরই মনে হবে সব স্বাভাবিক চলছে, তিব্বতের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে অনেক কিছু আমরা হারিয়েছি। তিব্বতীরা ছিল খোলামেলা মনের মানুষ, তাদের জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও রসবোধের পরিচয় সকলেই জানে। তারা ছিল উচ্ছল ও উদ্যমী। এখন তারা সবসময় গুম মেরে থাকে, অবদমিত। এটা আমি বারবার অনুভব করেছি। আমি যখন প্রকৃতির কথা বলছিলাম, তখন এটাকেও বোঝাতে চাইছিলাম। প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি যেমন শূন্য হয়ে গেছে, তেমন মানুষগুলোও ঊষর। উঁচু বাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আর উঁচু পদের চাকরির আড়ালে মানুষের নীরবতা।

তিব্বতীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সর্বব্যাপী। ভালোভাবে বানানো বড়ো বাড়িগুলো সব চীনাদের। বেশিরভাগ তিব্বতী থাকে ছোটো ছোটো ঘিঞ্জি নোংরা ঘরে। সবাই সাবলীলভাবে চীনা ভাষায় কথা বলে, যেন ওটাই এদেশের ভাষা। তিব্বতীরা যদি তাদের বাচ্চাদের তিব্বতী ভাষা শেখাতে চায়, তাহলে তা গোপনে নিজেদের ঘরে শেখাতে হয়। স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানের মাধ্যম চীনা ভাষা। ... আমাদের লোকেরা, বিশেষত যারা কমবয়সি, তারা চীনা পোশাকে নিজেদের সাজাচ্ছে। কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বলে মনে হয় না। বাইরের থেকে দেখলে মনে হয়, তিব্বতীরা যেন কম্যুনিজ্‌মকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভিতরে গভীরে গিয়ে আমি দেখেছি তারা বিক্ষুব্ধ। ... আমার ভগ্নীপতি চীনাদের অধীনে কাজ করে। সে আমাকে বলেছে, ওইভাবে কাজ করা, নিজে দমিত হয়েও ভালো থাকার ভাব দেখানো কেমন কঠিন। সে, আমার বোন এবং অল্প আর দু'চারজন বাদে, অন্য যাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, কেউ এব্যাপারে টুঁ শব্দ করেনি।

বেশিরভাগ তিব্বতীদের কাছে আমি ছিলাম বিদেশি। আমি ছিলাম অন্য দেশে, ওদের ধারণা ওখানে আমি একটা স্বাধীন জীবন কাটিয়েছি। ওরা যে দুঃখের মধ্যে দিয়ে এখানে জীবন কাটিয়েছে, তার কোনো ভাগ আমি নিইনি। আমাদের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বেশিরভাগ তিব্বতীর এরকমই ধারণা। ওদের সামান্য ক'জন মাত্র বোঝে যে আমরাও কষ্ট পেয়েছি। ওদের পক্ষে বোঝা মুশকিল যে কী কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। ওদের মনে হয় আমাদের জীবনে আমরা অনেক সুবিধা ও সুরক্ষা পেয়েছি। নির্বাসন ও পীড়ন যেন তিব্বতীদের দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছে — একদল নির্বাসিত এবং আরেকদল নিপীড়িত। প্রথমদিকে আমি এটা খুব তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম। দীর্ঘ বিচ্ছেদ মানুষকে বিভক্ত করে দেয়। ওরা যেমন আমাকে বুঝে উঠতে পারছিল না, আমিও ওদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না, পালিয়ে গিয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার যে বেদনা ও আতঙ্ক সেরকমই হল বাড়ি ফিরে আসায়। আমরা একই মানুষ, সবাই তিব্বতী। কিন্তু একে অন্যের দুঃখকষ্টকে চিনে উঠতে পারলাম না। বেশ কিছু বিষয়ে তাদের কাছে আমি অচিন মানুষ। চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে ওদের বশ্যতা ও নীরবতার অর্থ বুঝতে আমারও অনেকটা সময় লেগেছে।

এই যে এতগুলো বছর আমরা পৃথক ছিলাম, সেই সময় আমাদের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের কী প্রচণ্ড কষ্ট পেতে

হয়েছিল, সে সম্পর্কে অনেক ঘটনা শুনলাম। আমাদের বড়দার মৃত্যুর খবর শুনলাম। ১৯৬২–র দুর্ভিক্ষে চীন ও তিব্বতে লাখে লাখে মানুষ মারা যায়, তখন আমাদের আরেক ভাই ও এক দিদি কীভাবে মারা গিয়েছিল, তা বোনের কাছে শুনলাম। এই সমস্ত শুনে আমার মনে হল, ওখানে আর আমার জন্য কেউ নেই, কিছুই অবশিষ্ট নেই, যে বোনের কাছে গিয়ে উঠেছিলাম তাকে ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমি ভারতে ফিরে আসাই ঠিক করলাম।

যে তিব্বতে আমি ফিরে গিয়েছিলাম আর যে তিব্বতে আমি ফিরে যাব ভেবেছিলাম, এই দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাত। জানেন, আমাদের মতো বাস্তুচ্যুতদের কাছে এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যখন আমরা পরবাসে থাকি, তখন আমাদের ফেলে আসা দেশ–ঘরের একটা ছবি আমাদের মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখে আমরা আশাটাকে বাঁচিয়ে রাখি। সেই আপন গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য আমরা আকুল হয়ে উঠি। কিন্তু যখন আমরা সত্যিকারের যাই ? তখন একটা অন্যরকম বাস্তবতার মুখোমুখি হই। তিব্বতে যাওয়ার আগে আমার স্বামী ও আমি ভারতে বেশ থিতু হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিব্বত থেকে ঘুরে আসার পরে আমার এখানে মানিয়ে নিতে আরও অসুবিধা হচ্ছে। উদ্বাস্তু জীবনের পরেরদিকে যেমন এখানটাকেই আমার দেশ বলে মনে হচ্ছিল, এখন তা নয়। তিব্বতে যা দেখে এলাম, যা ফেলে এলাম, আমার মন জুড়ে তা এক অস্থিরতা তৈরি করেছে।

বিবেকের বন্দী : বন্দী বিবেক

"ভারতের ধূলাময় সমতলের দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় দুঃখে ভরে গেল। আমার গত ত্রিশ বছরের বন্দী জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি মনে পড়ে গেল। নিয়মিত পাঠচক্র আর স্বীকারোক্তির সভা, পুরস্কার আর শাস্তিপ্রদানের সভা, যা আমার জীবনকে এক নিয়মের নিগড়ে বন্দী করে রেখেছিল। ... এই বিদেশে এখন আমি মুক্ত। কিন্তু বন্দীদশার দগদগে ঘা আর বিভীষিকার ছায়া সবসময় আমাকে তাড়া করে বেড়ায় ... প্রতিদিন আমি আমার সহ–বন্দীদের সঙ্গে দেখা করি। অনেক কষ্ট করে আমরা হিমালয়ের পাদদেশ বেয়ে এক দুর্গম পথ ডিঙিয়ে এখানে এসেছি। ওদের মুক্ত হওয়ার আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে অন্যদের অতীত যন্ত্রণাভোগের স্বীকৃতি। স্রেফ বেঁচে যেতে পারার সৌভাগ্যে আমরা একে অপরকে অভিনন্দন জানাই ..."

এই কথা লিখেছেন পালদেন গিয়াতসো, ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বইয়ে। বইয়ের নাম 'এক তিব্বতী সন্ন্যাসীর আত্মজীবনী'। আমাদের লেখিকা হানি ১৯৯৮ সালে তাঁর সঙ্গে তিনবার দেখা করেন। সেই তিনটে সাক্ষাৎকার এবং ওই বই থেকে যা জানা যায় তা সংক্ষেপে এরকম :

পালদেন গিয়েতসোর জন্ম ১৯৩৩ সালে, দক্ষিণ–মধ্য তিব্বতের সাং সমভূমির পানাম এলাকার এক উচ্চশ্রেণীর ধনী পরিবারে। পালদেনের জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁর মা মারা যান। তিন বোন ও দুই ভাইয়ের সংসারের দায়িত্ব পড়ে বাবার ঘাড়ে। তাঁর বাবা অবশ্য পরে আরেকটি বিয়ে করেন। পালদেনের পরিবারের লোকজন খুব কম বয়স থেকেই বালক পালদেনের মধ্যে নানা ঐশ্বরিক চিহ্ন খুঁজে পায়। ছোটোবেলায় তাঁর নাম ছিল নোদুপ। দশ বছর বয়সে তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার সময় পরিবারের লোকজন তাঁর নাম রাখে পালদেন। সেই থেকে তিনি তাঁর কাকার কাছে এক বিশাল মঠে থাকতে শুরু করেন এবং কাকার কাছেই তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার শুরু হয়। সেখানে দ্রেপাং থেকে গেশি (অর্থাৎ অধ্যাপক) রিগজিন টেম্‌পা একবার বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আসেন। দ্রেপাং তখন তিব্বতের শ্রেষ্ঠ তিনটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। রিগজিন টেম্‌পার জন্ম হয়েছিল ভারতে। তাঁর বক্তৃতা শুনে পালদেন বুঝতে পারেন, কাকার কাছে যে গ্যাদং মঠে তিনি থাকতেন সেটা একটা কুয়োর মতো। বৌদ্ধ দর্শনের মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটতে হলে দ্রেপাং যেতে হবে।

পরে রিগজেন টেম্‌পার আহ্বানে দ্রেপাংয়ে পড়তে যাওয়ার একটা সুযোগ এলেও বাবা–কাকারা তাঁকে ছাড়তে চাননি। পালদেং তখন দ্রেপাং যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালাবেন ভেবেছিলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি সেখানে যাওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু কাকা অসুস্থ বলে তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে পাঠানো হয়। বৃদ্ধ কাকাকে দেখভাল করা এবং গ্যাদংয়ের মঠ পরিচালনার জন্য তাঁকে সেখানে থেকে যেতে হয়। অনেক পরে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ভারতে এসে দলাই লামার সঙ্গে দেখা করেন। দলাই লামার নির্দেশে তিনি আবার তাঁর শিক্ষকদের কাছে দ্রেপাংয়ে ফিরে যান। তখন বাড়ির লোকেরা আর তাঁকে বাধা দেয়নি। ইতিমধ্যে, তাঁর ভাষায়, "১৯৫২ সালেই কুড়িজন তরুণের সঙ্গে এক মঠে আমি সন্ন্যাসী হওয়ার শপথ গ্রহণ করি। ... সেই কুড়িজনের মধ্যে আজ আমি একাই বেঁচে আছি। ওদের কেউ মারা গিয়েছে কারাগারে, কাউকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় পিটিয়ে মারা হয়েছে।"

ভারতে দলাই লামার সঙ্গে দেখা করে আসার পরে দ্রেপাংয়ের মঠে বেশিদিন থাকা গেল না। পূর্ব তিব্বতের থেকে তিব্বতীরা পালিয়ে এসে জানালো, চীনারা সব মঠ ধ্বংস করে দিচ্ছে। ১৯৫৯–এর অভ্যুত্থানের পরে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পালদেন তখন শুনেছিলেন যে লাসায় চীনাদের তিব্বত থেকে ফিরে যাওয়ার দাবিতে মহিলাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কুন্দালিং কুসাংলা। এই মহিলাকে পরে কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে দেখেছিলেন পালদেন।

রাতের অন্ধকারে দ্রেপাং মঠ ছেড়ে যখন সব সন্ন্যাসীরা পালালো, তখনও পালদেন এবং আরও দুজন থেকে গেলেন। কারণ তাঁদের ৭২ বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক গিয়েন রিগজিন টেম্‌পা তখন চলচ্ছক্তিহীন। শেষে চীনারা দ্রেপাং মঠে গোলাবর্ষণ শুরু করলে পালদেনরা তিনজন গিয়েনকে পিঠে তুলে পালালেন। তিনজনে পালা করে করে অধ্যাপককে বয়ে নিয়ে চলে গেলেন পালদেনের বাসস্থান পানাম এলাকায়। সেইখানে সেই গ্যাদং মঠে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। যদিও পানাম ছিল তিব্বতের বেশ অন্তর্বর্তী একটা জায়গা। কিন্তু পালদেনের ভাষায়, "চীনারা মাকড়সার মতো তিব্বতের সর্বত্র তখন জাল ছড়িয়ে ফেলছে এবং আমাদের আর কিছুই করার নেই।"

শীঘ্রই শুরু হয়ে গেল মিটিং আর আলোচনার পর আলোচনা। এগুলো পরিচালনা করত চীনা অফিসারেরা আর একজন তিব্বতী দোভাষীর কাজ করত। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল উপস্থিত শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। সব মানুষকে প্রধান চারটে শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা হল — জমিদার, ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক ও গরিব কৃষক। পালদেন বলছেন, "পারিবারিক পরিচয়ে আমি ছিলাম ধনী সন্ন্যাসী। তার অর্থ নতুন সর্বহারার সমাজে আমার আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। প্রত্যেকের পরিচয়পত্রে সে কোন শ্রেণী

থেকে এসেছে তা লেখা থাকবে এবং খাদ্য, শিক্ষা ও চাকরি কে কেমন পাবে তা নির্ধারণ করবে ওই শ্রেণী পরিচয়ই।"

প্রথমে মঠের সন্ন্যাসীদের বলা হত, তারা শোষণ চালানোর কথা স্বীকার করুক। তাতে বেশি সাড়া না পেলে সবাইকে ডেকে জনসমক্ষে স্বরূপ উন্মোচনের নাম করে তাদের হেয় করা হত। ধনী সন্ন্যাসীর জিনিসপত্রের সঙ্গে গরিব সন্ন্যাসীদের সম্বলগুলোর ফারাকও দেখানো হত। গ্রামবাসীদের ডেকে এই ফারাক দেখানোর সময়ে সম্পদের এই অসাম্য দেখে গ্রামবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিস্ময় প্রকাশ করতে হত। সেরকম না করলে, যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে 'থামসিং' নামক এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করলে তাদের ওপর পার্টির ক্যাডাররা নজর রাখত। এবং সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বা পরের দিন সকালে পার্টির অফিসারেরা তাদের সঙ্গে দেখা করত। ... পরের মিটিংয়েই তাদের কোনো নিরীহ একজনের চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে গালাগাল দিতে হবে এবং এইভাবেই পার্টির প্রতি ভালোবাসা ও জনগণের পক্ষে দাঁড়া নোর প্রমাণ দিতে হবে।

সবটাই পালদেনের কাছে বানানো একটা নাটকের মতো মনে হত, যেখানে সবাই অভিনয়ে অংশ নিতে বাধ্য। পালদেনের মোট ৩১ বছরের বন্দী জীবনের মধ্যেই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' হয়েছিল। সে সময়ে পালদেন লিখছেন, "সমালোচনা ও দোষ স্বীকার করার অবিরাম অনিঃশেষ চাপ ছিল। ফলে পারস্পরিক নজরদারি ও সন্দেহ করার একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। শত শত জোড়া চোখ আপনার সমস্ত নড়াচড়ায় নজর রাখছে। ভয়ে যেন আমরা বশীভুত, অবনত হয়ে পড়েছিলাম। যদিও চীনা কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অন্তরে আমি এক তিক্ত অনিচ্ছা পোষণ করতাম ... বন্দীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল। আমরা জানতাম, সবাই আমরা একই জিনিস করতে বাধ্য হচ্ছি। সেহেতু, যদিও প্রথমদিকে সমালোচনা করার ফলে শত্রুতা গড়ে উঠেছিল, আমরা যে কোনো অভিযোগকারীকে ক্ষমা করতে শিখে গিয়েছিলাম এবং কেউই কারোর প্রতি মনে কোনো রাগ পুষে রাখতাম না ... আপনার কোনো উপায়ান্তর নেই ... এই ধরনের সমালোচনা-সভায় যোগ না দিতে চাওয়া হচ্ছে সমাজবিরোধী কাজ — প্রায় বিদ্রোহ দেখানোর মতো — ওরা চাইত আমরা সহবন্দীর ক্ষতি করি, যেন সবাই পরস্পরের শত্রু ..."

১৯৬০ সালে পালদেন প্রথমবার গ্রেপ্তার হল গ্যাদং মঠ থেকে। সেখানে তাঁর সেই বৃদ্ধ শিক্ষক রিগজিন টেম্‌পার তৈজসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে চীনারা একটা ফটো দেখতে পায়। সেখানে একদল তিব্বতী প্রতিনিধির মধ্যে রিগজিনের ছবি। তারা দাঁড়িয়ে আছে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা নেহেরু এবং গান্ধীর সঙ্গে। চীনারা খুব উত্তেজিত হয়ে রিগজিনকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। তিনি সবই জানান, তিনি যে ভারতীয় নাগরিক এবং সেখান থেকে লাসায় ছাত্র হিসেবে এসেছিলেন, শেষে চীনা অফিসারদের অনুরোধ করেন তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। পালদেন তাঁর শিক্ষককে কিছু বইপত্র সহ ছোটো একটা ব্যাগ গুছিয়ে দিতে সাহায্য করেন। চীনা অফিসারদের আদেশ মতো সেই ব্যাগ নিয়ে হেঁটে গিয়ে তিনি একটা জিপগাড়িতে ওঠেন। দুজন বন্দুকধারী পাহারাদার তাঁকে নিয়ে চলে যায়। সেই শেষ দেখা। তারপর আর পালদেন কোনোদিন রিগজিন টেম্‌পাকে দেখতে পাননি।

এরপর শুরু হয় পালদেনের ওপর অত্যাচার। তাঁর শিক্ষক যে ভারতীয় গুপ্তচর এই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পালদেনকে দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে পেটানো হয়েছে ব্যাটন দিয়ে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে। বারবার তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন। জ্ঞান ফিরেছে নিজেরই পেচ্ছাপ আর বমির মধ্যে শুয়ে। আবার তাঁর ওপর চালানো হয়েছে অমানুষিক অত্যাচার। পালদেন বারবার বলেছেন যে তাঁর শিক্ষক গুপ্তচর নন। তবু তাঁর কাছ থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অত্যাচার করা হয়েছে। শেষে তা না পেয়ে তাঁকে সাত বছরের জেলের সাজা দেওয়া হয়েছে। পালদেনের ভাষায়, "কোনো শুনানি হয়নি, কোনো আবেদনের অধিকার দেওয়া হয়নি। আমাকে সাত বছরের জন্য কয়েদ করা হয়েছে আর গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর লেবেল — এ এমন এক চিহ্ন যার জন্য আমার সাত বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও আরও তিন বছর আমার কোনোরকম রাজনৈতিক অধিকার থাকবে না।"

এত অত্যাচার পালদেন সহ্য করে গেছেন শুধু এই কথা ভেবে যে লড়াইটা তাঁর প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত নয়, লড়াইটা হল পার্টির নিপীড়কক্ষমতার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও সেই ধর্মের প্রতি আনুগত্যের। এই বোধ তাঁকে এক আত্মিক শক্তি জুগিয়েছিল। এই শক্তির জোরেই পালদেন তাঁর বন্দীজীবনের প্রতিটা খুঁটিনাটি মনে রেখেছেন এবং আশা রেখেছেন যে মুক্তির পর তিনি তাঁর সহবন্দীদের মুখপাত্র হিসেবে বাইরের সবাইকে সব কথা জানাবেন। সে কারণে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, যাদের 'মৃত্যুশিবির'-এ পাঠানো হয়েছিল তাদের সকলের নাম, ১৯৬০-এর দুর্ভিক্ষে যেসব বন্দীর অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল তাদের নাম। এর পাশাপাশি পার্টির ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের বিরোধের বিষয়টাও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে লেখিকা হানির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এ কেমন অদৃষ্টের পরিহাস যাতে তথাকথিত শ্রেণীহীন সমাজ তার সদস্যদের জোর করে এমন এক রাজনীতি গেলাচ্ছে যেখানে প্রশ্নহীনভাবে পুজো করতে হবে মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স, লেনিন, স্তালিন থেকে সর্বশেষ 'ভগবান মাও'-এর মতো সমস্ত কম্যুনিস্ট নেতাদের, আরও ক্রোধের সঙ্গে পালদেন বলেন, পার্টি মিথ্যে গর্ব করেছিল যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন মানুষও না খেয়ে মরতে পারে না। অথচ বন্দীরা ভয়ে অনাহারে মৃত্যুর কথা বলত না, সেটাকে চালিয়ে দেওয়া হত স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে।

১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হল। সেইসময় পালদেন সাতজন বন্দী সহ জেল থেকে পালালেন। পালাতে পালাতে চীন সীমান্ত প্রায় পার হয়ে যাওয়ার মুখে সবাই ধরা পড়ে গেল। আবার জিজ্ঞাসাবাদের নামে অত্যাচার শুরু হল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পালদেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন তারা পালাচ্ছিল? পালদেন বলেছিলেন, এটা খুব স্বাভাবিক। ১৯৬০ সালে গ্রেপ্তার করার পর থেকে আমার ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল, যেভাবে আমার চোখের সামনে বন্দীরা খেতে না পেয়ে মারা গিয়েছিল, তারপরও যেভাবে আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণা আর মৃত্যুর প্রতীক্ষা নিয়ে বেঁচেছিলাম, তাতে পালানোটাই স্বাভাবিক।

এবার পালদেনের আরও আট বছরের অর্থাৎ সব মিলে মোট পনেরো বছরের জেল খাটার সাজা হল। আবার তাঁর দুই হাতে আর

পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। এইসময় সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ অনুসারে পালদেনকে তাঁত বোনার কাজ শিখতে হয়েছিল। দু'পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের মাঝে তিনি বিকেলের দু'ঘন্টার বিশ্রামের সময়ে প্রার্থনা করতেন। এই প্রার্থনা তাঁকে মনের জোর বাড়াতে সাহায্য করেছিল। অনেক বন্দী আত্মহত্যা করল। পালদেন মনের জোরে বেঁচে থাকলেন শুধু অত্যাচারীদের অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে থাকার সাহস দেখাতে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে চার পুরনোকে দূর করার নামে পুরনো রীতি, পুরনো অভ্যাস, পুরনো ঐতিহ্য ও পুরনো চিন্তা ধ্বংসের নামে পালদেনদের প্রিয় সমস্ত অবলম্বন পুড়িয়ে ধ্বংস করা হল। ... কারাগারে নতুন ভাষায় বলা ও লেখা চালু করা হল। সে ভাষায় নতুন সর্বহারা সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন সব সমাজতান্ত্রিক শব্দ। ইচ্ছা না থাকলেও বন্দীরা ওইসব মেনে নিয়ে সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করত।

আর তা না করলে কী হত, পালদেন তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। প্রত্যেকদিন সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মিটিং হত। বেশিরভাগ সময় পালদেন নিজেকে অলস বলে আত্মসমালোচনার পর্ব সারতেন। একদিন তিনি কোনো আত্মসমালোচনা না করায় তাঁকে তাঁর সেলের নেতা বলেন, 'পালদেন নিজেকে পুরো শুধরে ফেলেছে আর তাই তাঁকে মুক্তি দেওয়া উচিত। তাই না?' তারপর সেদিন সন্ধ্যে থেকে লড়াইয়ের মিটিং শুরু হয়। সেখানে সবার মধ্যে পালদেনকে ডেকে দাঁড় করিয়ে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করো' আওয়াজ তুলে সেলের প্রহরী ও সেলের নেতা প্রথমে তাঁকে আঘাত করে। তারপর সব বন্দীকে দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করার শ্লোগান দেওয়ানো হয় আর তাঁকে ক্রমাগত মারতে থাকে। গোটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর্যায়ে পালদেনকে এইভাবে পেটানো হয় ৩০ থেকে ৪০ বার।

আরেকবার পালদেনকে চোখে জলের ঝাপটা দিতে দেখে একজন সহবন্দী। সমালোচনার মিটিংয়ে এসে সে অভিযোগ করে যে ওইভাবে জল দেওয়া আসলে তিব্বতী ধর্মরীতিতে ঈশ্বরকে জল উৎসর্গ করা। এই ঘটনা নিয়ে ১৩টা ভর্ৎসনা সভা হয়। সেখানে সহবন্দীরা পালদেনকে মারার বদলে জামা ধরে ঝাঁকাতো। কারণ পালদেনকে তারা মারতে চাইত না এবং মার খেয়ে খেয়ে পালদেনের শারীরিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। যাই হোক, এতেও পালদেনের স্বীকারোক্তি আদায় করা গেল না। কর্তৃপক্ষ ভয়ানক চটল। কারণ পালদেন যা করেছেন তা ধর্মীয় কাজ এবং গর্হিত অপরাধ। তাই শাস্তিস্বরূপ একদিন ভোরে পালদেনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল এক বধ্যভূমিতে। সেখানে পনেরোজন বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে বলে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। পালদেনকে তাদের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো হল। সেখানে একজন নতমস্তক মহিলার চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে সোজা করা হল আর একজন সৈন্য তার অপরাধের ফিরিস্তি দিতে থাকল। পালদেনের শরীর শিউরে উঠল — এই সেই বীরাঙ্গনা মহিলা কুন্দালিং কুসাংলা — ১৯৫৯ সালের তিব্বতীদের অভ্যুত্থানে যিনি মহিলা বাহিনীর নেত্রী ছিলেন। তাঁর মুখের চামড়া বয়সের ভারে কুঁচকে গেছে, মুখে অত্যাচারের দাগ, বিকৃত ফোলা মুখে একটাও দাঁত নেই। ক্ষোভে ভয়ে পালদেনের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একজন প্রহরী তখন বলছিল, "বুঝেছ, একেবারে খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছ।" পালদেনের সামনে ওই পনেরোজন বন্দীকে গুলি করে মেরে গর্তে ফেলে দেওয়া হয়।

মৃত্যুভয় দেখানো, অত্যাচার, কোনো কিছুতেই চীনারা পালদেনকে কাবু করতে পারেনি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অনেক বন্দী যে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিল, তাকেই পালদেনের মনে হয়েছিল তিব্বতীদের জয়ের চিহ্ন। পনেরো বছর জেলে কাটানোর পর পালদেনকে জানানো হল যে তাঁকে আরও আট বছর শ্রমশিবিরে থাকতে হবে। আবার আট বছরের জন্য বন্দী থাকার এই ঘোষণা পালদেনকে মনে মনে দারুণ আঘাত করলেও বাইরে তিনি তা প্রকাশ করলেন না। উল্টে জেলখানা থেকে শ্রমশিবিরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি দাবি করলেন যে গ্রেপ্তার করার সময় বাজেয়াপ্ত করা তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হোক। ফেরত নেওয়ার সময় তিনি দেখলেন যে তাঁর প্রিয় বড়োদাদার উপহার দেওয়া একটা সোনার রোলেক্স হাতঘড়ি নেই। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে চীনা অফিসারকে বললেন, "এই হাতঘড়ি চুরি করা পার্টির নিয়ম–বিরোধী, চেয়ারম্যান মাও পিএলএ–কে (গণমুক্তি ফৌজ) কতকগুলো আচরণবিধি শিখিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা হল বন্দীদের একটা আলপিনও গ্রহণ না করা। একমাত্র একজন প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যই একজন বন্দীর জিনিস চুরি করতে পারে।"

এরপরের আট বছর তিনি নিয়েথাং লুয়াওয়া চ্যাং নামক এক টালির কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। সেখানে তিনি তাঁদের বাড়ির এক পুরনো ভৃত্যের কাছে খবর পান, গণআদালতে বিচারের সময় তাঁর বোনেদের বাবাকে জনসমক্ষে হেয় করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর বাবাকে পিটিয়ে মারা হয়। পরে তাঁর দাদারও একই পরিণতি হয়। আর তাঁর সৎমা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েন। এইসব ঘটনা জানার পর পালদেন ঘুমাতে পারতেন না, বিশ্রামও নিতে পারতেন না। তাঁর খালি পরিবারের সবার কথা আর তাদের দুর্ভোগের কথা মনে পড়ে যেত। ইতিমধ্যে মাও সেতুঙের মৃত্যু হল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় যেসব বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা নিয়ে পার্টির মধ্যেও সমালোচনা উঠল। সেই সময় গিয়েন সামসুং ওয়াংচুক নামক একজন বয়স্ক লামার সঙ্গে মাঝবয়সি পালদেন ঠিক করেন যে তাঁরা তিব্বতী জনগণের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র লিখবেন। কারণ সেই সময় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমালোচনার কালে তিব্বতীদের গলার ফাঁস একটু আলগা হলেই 'গতদিনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা'র কথা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা দলাই লামার 'বিশ্বজনীন সত্য' নামক প্রার্থনার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচারপত্র লেখেন। তার এক অংশে ছিল, তিব্বতীদের যে দুঃখ–যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, তার বর্ণনা। দ্বিতীয় অংশে ছিল, স্বাধীন জাতি হিসেবে তিব্বতীদের ২৫০০ বছরের ইতিহাস।

এটাই ছিল মাওয়ের মৃত্যুর পর লাসার দেওয়ালে প্রথম পোস্টার। এই ঘটনায় রাজধানীতে খুব নাড়াচাড়া পড়ে যায়। এরপরও পালদেনের লেখা আরেক প্রস্থ প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়। সেইসময় তিব্বতী বন্দীদের কী অবস্থা সে সংবাদও তিনি ভারতে পাঠাতে সমর্থ হন। এর মধ্যে জেলের ভিতর ওয়াংচুকের মৃত্যু ও বন্দীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাও দলাই লামা সহ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ১৯৮৩–তে সামান্য কিছুদিনের জন্য মুক্তি দেওয়ার পরে ১৯৮৪–র এপ্রিলে পালদেনকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিচারের সময় প্রকাশ্যে তিনি তিব্বতে চীনা শাসনের বিরোধিতা করেন। তাঁকে আরও আট বছরের জন্য জেলে পাঠানো হয় — এবার অরিথ্রিড়ুর বন্দীশালায়। মাওয়ের যুগ শেষ হয়ে তখন দেঙ–এর যুগ শুরু হয়েছে। কিন্তু বন্দীদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। পালদেন তাঁর কয়েদি জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ওপর মারাত্মক নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। ইলেকট্রিক শক দেওয়া থেকে আরম্ভ করে মুখের মধ্যে ব্যাটন ঢুকিয়ে দেওয়া, যতরকমভাবে যন্ত্রণা দেওয়ার পর ... পালদেন বর্ণনা দিচ্ছেন, "ভীষণ যন্ত্রণায় বমি করতে গিয়ে দেখি আমারই রক্তের মধ্যে আমারই তিনখানা দাঁত উপড়ে এসেছে। পরে আমার সব দাঁত চলে যায়।"

তাঁর ভাষায়, "দেঙ কোনোভাবেই মাওয়ের থেকে ভালো নয়। ওয়াচ টাওয়ারের মাথায় সৈন্যদের বদলে ভিডিও ক্যামেরা, মারার জন্য লাঠির বদলে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার রড। অত্যাচারের কায়দা পাল্টেছে, কিন্তু অত্যাচারের অস্তিত্ব ঘোচেনি। কারাগারের প্রহরীরা হয়তো আরও আধুনিক হাতিয়ার নিয়ে আরও আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু চারিদিকের উঁচু প্রাচীরের পিছনে সমস্ত কিছুকে ঘিরে যে দৃষ্টি তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।"

পালদেন তখন জানতেন না যে ১৯৮৩ সালেই তাঁর ঘটনা দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়ে এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাঁকে বিবেকের বন্দী বলে ঘোষণা করে। এইসব আন্তর্জাতিক চাপেই শেষপর্যন্ত ১৯৯২ সালে পালদেন মুক্তি পান। ততদিনে তিব্বতের মুক্তিকামী সংগ্রামী যুবকদের কাছে তিনি এক জীবন্ত রূপকথার নায়ক। আমাদের লেখিকা ১৯৯৮ সালের পরে ২০০২ সালেও তাঁর সঙ্গে আরেকবার সাক্ষাৎ করেন। তারপর ২০০৬ সালে শীতকালে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলে তিনি দেখা দিয়েও আর কথা বলতে চাননি। ধরমশালায় সেই শীতের সন্ধ্যায় হানির মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, তবে কি বয়স ও বিস্মরণ সেই একাকি বৃদ্ধকে গ্রাস করে ফেলল? অথবা, ত্রিশ বছরেরও বেশি বন্দীজীবনের ভয়াবহতা, অন্তরের যন্ত্রণা তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে?

এক অতৃপ্ত শূন্যতা

ভয়ানক অত্যাচার ও মৃত্যুর হাত থেকে যারা বেঁচে ফেরে, তাদের নানারকম মানসিক রোগ দেখা যায়। হানি একজন মনোচিকিৎসক হিসেবেও এইসব অত্যাচারিত, নির্বাসিত তিব্বতীদের দেখেছেন। তিব্বতীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পালদেন যেমন একজন পুরোধা ও পুরোনো কর্মী, তেমনই নতুন এক রাজনৈতিক কর্মী হল নবীন সন্ন্যাসী বাগদ্রো। বাগদ্রোর জন্ম সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ১৯৬৫ সাল নাগাদ। তাঁর বাবাও মঠের সাধু ছিলেন। কিন্তু বাগদ্রোর জন্মের আগেই চীনারা তিব্বত দখল করার পরে সেই মঠ ভেঙে দেওয়া হয় এবং তাঁর বাবা সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করেন। খুব ছোটোবেলা থেকেই বাগদ্রো দেখতেন, গ্রামের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন মানুষকে খালি গায়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের মাথা অর্ধেক কামানো, মুখে কালি লেপা আর সারা গায়ে নানারকম পোস্টার সাঁটা। সঙ্গে মাইকে তাদের সম্পর্কে নানা মন্তব্য ঘোষণা করা হচ্ছে। শেষে তাদের একটা কাঠের সঙ্গে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তাদের মধ্যে অনেকেই সেই ঝুলন্ত অবস্থা থেকে পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আহত হত। আর দর্শকদের বাধ্য করা হত তাদের থুতু দিতে আর গালিগালাজ করতে। এর সঙ্গে সঙ্গে চলত বন্দীদের ওপর লাথি, মার ও চিৎকার। অনেকে এই অত্যাচারে মারাও যেত। ... বালক বাগদ্রো এসবের কারণ বুঝতেন না। বাড়িতে বাবা–মাকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তাঁকে চুপ করতে বলতেন এবং আর কোনো প্রশ্ন না করতে বলতেন। বাগদ্রো দেখতেন, তাঁর বাবা–মা সবসময় কেমন যেন ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন।

সেইসময় সারাদিন প্রতিটা রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাউডস্পিকারে সকাল থেকে সন্ধ্যা চেয়ারম্যান মাওয়ের মহত্ত্ব প্রচার করে ধারাবাহিক বক্তৃতা চলত। বুদ্ধ ও অন্যান্য দেবতার পরিবর্তে মাও, স্তালিন, মার্ক্স ইত্যাদিদের ছবি টাঙানো থাকত। প্রত্যেককে, বিশেষত ছোটোদের সবাইকে, মাওয়ের লেখা ছোট্ট 'রেডবুক' দেওয়া হত। সেই বই সেই সময়ের এমন পবিত্র প্রতীক ছিল যে তার থেকে একটা শব্দও ভুলে যাওয়াকে সহজে ক্ষমা করা হত না।

বাগদ্রোর ভাষায়, "স্কুলে কোনো ক্লাস করতে হত না। আমরা শুধু মতাদর্শ শিখতাম। তাছাড়া অন্য কোনো বিষয় ছিল না। স্কুল শুরু হত মাওয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে। 'মাও আমাদের হৃদয়ে লাল তারা', 'মাও সেতুঙের চিন্তাধারাই আমাদের জীবন' — এইসব কথার শুধু পুনরাবৃত্তি করে যেতাম। স্কুলে কেবল সিনেমা দেখানো হত, সেখানে শুধু চীনাদের বীরত্বের কাহিনী। ভয়ানক হিংস্র সব যুদ্ধ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চীন–আমেরিকার যুদ্ধ, চীন–জাপান ও চীন–ভিয়েতনামের যুদ্ধ। সব ক'টা সিনেমাই শেষ হত এই বক্তৃতা দিয়ে যে মহান নেতা মাও ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি কীভাবে আমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছে। কত যে অসংখ্যবার আমি ওইসব সিনেমা দেখেছি, তা আমি বলতে পারব না। ...

রাস্তায় যত পশু দেখা যেত, সেগুলোকে মেরে ফেলার জন্য বাচ্চা ছেলেদের গুলি করা ও লড়াই করা শেখানো হত। আমাদের রোজই নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ মেরে কম্যুনিস্ট ক্যাডারদের কাছে জমা দিতে হত। তখনকার দিনে বলা হত, তিব্বতীদের মধ্যে মঠের সন্ন্যাসীরা সবচেয়ে খারাপ। যদিও আমার বাবা মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু ছোটোবেলায় আমি সন্ন্যাসী কাউকে চোখেও দেখিনি। আসলে, অনেক পরে দলাই লামার বই যখন পড়েছিলাম, তার আগে অবধি জানতাম না যে তিনি বেঁচে আছেন। ছোটোবেলায় আমরা জানতাম, তিনি একজন অতীতকালের ব্যক্তি, যিনি ধর্মের মুখোশ ব্যবহার করে সাধারণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

আমি তখন এত ছোটো যে কিছুই বুঝতাম না। ভাবতাম যে যুদ্ধ–লড়াইয়ের মধ্যেই শক্তি লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমি শুধু খাবারের জন্য লড়তাম। কারণ আমার সবসময় খিদে লেগে থাকত। বাড়িতে খাবার থাকত না। ভোর থেকে ভিক্ষে করতাম আর রাস্তায় নোংরা ফেলার গাদা থেকে খাবার খুঁজতাম। শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি যা পেতাম তাই খেতাম। বাড়িতে ফিরতে চাইতাম না। কারণ বাড়িতে খাবার থাকত না। বাবা আর মা সবসময় ক্লান্ত বিধ্বস্ত থাকতেন। ওঁরা সকালে দূরের এক জঙ্গলে গাছ কাটার কাজ করতে বেরোতেন। সারাদিন

কাজের পর সন্ধ্যেবেলা একটানা মিটিংয়ে থাকতে হত রাজনৈতিক বক্তৃতা শোনার জন্য। তারপর তাঁরা অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও তাঁরা এত কম পরিমাণ রেশনের খাদ্য পেতেন যে তা দিয়ে আমাদের পরিবারের ছয়জনের এক সপ্তাহের বেশি চলত না। মাসের বাকি দিনগুলো প্রায় না খেয়ে কাটাতে হত। সব পরিবারেই এই একই অবস্থা চলছিল। ফলে আমরা সবাই চোর বা ভিখিরি হয়ে পড়লাম। ... চীনারা বলেছিল, তুমি যত উৎপাদন করবে, তত তুমি খেতে পাবে ... কিন্তু দেখা গেল, যতই খাটো না কেন, খাবারের কোটা আর বাড়ে না। বুড়োরা, শিশুরা সবাই সকাল থেকে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত আর খাবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাদের জুটত কঠিন শাস্তি। ... একটা সময় সেই সামান্য খাবারের রেশনও বন্ধ হয়ে গেল। আমার বাবা অনেক দূরে দূরে গিয়ে ভিক্ষা করা শুরু করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যেতাম। ঘরে মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। সে সময়ে আমরা কাঠ সিদ্ধ করেও খেয়েছি। কিন্তু খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে এল। শেষে তাঁর কোলে লুটিয়ে পড়ল আমার সবচেয়ে ছোটো বোন। মায়ের শুকনো স্তনে মুখ রেখে তার মৃত্যু হল। আমার মা নিজের চুল ছিঁড়ে নিজেকে আর দুনিয়ার সবাইকে উন্মাদের মতো অভিশাপ দিতে লাগলেন।

এরকম সব ঘটনা বাগদ্রোর ভিতরে চিরন্তন ক্রোধ আর ক্ষুধার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল সারাটা জীবন ধরে। ১৯৮০ সালে যখন তিব্বতীদের গলার ফাঁসটা খানিক আলগা করা হল, তারা তিব্বতী ভাষায় কথা বলা এবং তিব্বতী পোশাক পরার অনুমতি সহ আরও কিছু স্বাধীনতা পেল। তখন বাগদ্রো গ্যানদেন মঠে সন্ন্যাসী হিসেবে যোগ দিলেন। সালটা ছিল ১৯৮৩ এবং তাঁর বয়স তখন আঠারো। বাগদ্রো নিজে বলেন, "আমি কোনো ধর্ম বা স্বাধীনতার ভাবনা থেকে মঠের সন্ন্যাসী হইনি। আমি আসলে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার অন্তস্থ ক্রোধ ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেতেই আমি মঠে ঢুকেছিলাম।" এরপরে তিনি দলাই লামার আত্মজীবনী 'আমার দেশ, আমার মানুষজন' পড়েন। এই বইটা তাঁকে গোপনে উপহার দিয়েছিলেন তাঁদের মঠ পরিদর্শন করতে এসে এক বিদেশি ভ্রমণার্থী। ১৯৮৮ সালের ৫ মার্চ মোনাম উৎসবে বিক্ষোভ দেখানোর সময় বাগদ্রোর ছবি উঠে যায়, দেখা যায় যে তিনি চীনা সৈন্যদের দিকে পাথর ছুঁড়ছেন। চারমাস আত্মগোপন করে থাকার পর বাগদ্রো গ্রেপ্তার হন। এক চীনা সৈন্যকে হত্যা করার অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিনা বিচারে আটক করে রেখে বাগদ্রোকে একের পর এক জেলে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়।

জেলেও তাঁকে দিনের পর দিন খেতে দেওয়া হত না। খিদের জ্বালায় পাগল বাগদ্রো একবার জেলের পায়খানায় ভেসে যাওয়া মানুষের বিষ্ঠা জড়ানো মোমো মুখে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এইসব ঘটনা আজও তিনি ভুলতে পারেননি। মুক্তি পাওয়ার পরেও ভারতে এসে ধরমশালায় লেখিকা হানির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তাঁর অনেকরকম মানসিক চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু কখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হননি। দেশে-বিদেশে বহু জায়গায় তিনি তাঁর এইসব দুর্ভোগের বৃত্তান্ত বলেছেন। কিন্তু হানি দেখেছেন, এখনও বাগদ্রো রাস্তাঘাটে যাকে তাকে ধরে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো জানাতে চান। তাঁর ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করে ছাপিয়ে দেয় 'তিব্বতী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক' নামক এক সংস্থা। সেই প্রচারপত্র বিলি করে বাগদ্রো যেন তাঁর সেই লাঞ্ছনা ও ক্রোধ প্রশমিত করতে চান। বারবার সেই খিদের যন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে বাগদ্রোর ভিতরে এক শূন্যতাকে দেখতে পাওয়া যায়। এই শূন্যতা জন্ম নিয়েছিল তাঁর অতীত জীবনের উদ্‌ভ্রান্তি ও হিংসার সময়ে। বাগদ্রো এই শূন্যতাকে মোকাবিলা করার মতো কোনো 'অন্তর্বস্তু' খুঁজে পাননি। [ক্রমশ]

২ পৃষ্ঠার শেষাংশ ... শ্যামলী খাস্তগীর স্মরণে

জীবনভর খেলে বেড়াতো। অন্যেরা যখন বলেছিল শান্তিনিকেতনের আত্মপ্রদীপ নিভে গিয়েছে, তখন তিনি তার শিখা জ্বালিয়ে তুলেছিলেন এবং নিজের মধ্যে সেই দীপালোক বয়ে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির দরজা সকলের জন্য খোলা ছিল। সেখানে সবাই মিলে গিয়ে পড়াশুনা করা, আড্ডা মারা, ধরাবাঁধা ছকের বাইরে নানারকম কর্মশালা করা আর তার সঙ্গে তাঁর প্রবাদপ্রতিম রান্না করা সুখাদ্য ও গানবানানোর মজা সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাদের স্মৃতিতে সেসব উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমার কাছে এবং আমার মতো অনেকের কাছে শান্তিনিকেতনকে অর্থবহ করেছেন শ্যামলীদি।

আমার সঙ্গে তাঁর শেষবার যখন দেখা হয়, তখন তাঁকে আমি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা থেকে কয়েক লাইন গান গেয়ে শুনিয়েছিলাম। পরেরদিন সকালে তাঁকে আমরা গাড়ি করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, ওখানকার তিলুটিয়া গ্রামে তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য। সেদিন আনন্দ বলছিল, উনি নিজেই আসলে চিত্রাঙ্গদা। শ্যামলী দুর্জয় সাহস ও নিঃস্বার্থ আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে দিয়ে একটা জীবন কাটিয়ে গেলেন এবং সত্যের দিকে তাঁর নিজের পথ ধরেই চলে গেলেন। এইজন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরেই শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে থাকবেন। আমরা যদি পরে তাঁর কথা খানিক ভুলেও যাই, তাঁর সততাময় চোখ দুটোর সৌন্দর্য আমরা ভুলব না। সেই চোখ যা মানুষের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ দৃশ্যাভিনয়ের সাক্ষী এবং তা সেই চোখ থেকেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে তাঁর অসাধারণ ভালোবাসতে পারার ক্ষমতায় আরও বড়ো হয়ে আরও বিপুল বৈভবে।

নাইজেল হিউজ, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্থ সায়েন্সেস, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; অনুবাদ : তমাল ভৌমিক

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা ২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তাঁকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
দরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬; ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com